জীবন যদি হতো নারী সাহাবির মতো

ড. হানান লাশিন

বই :	জীবন যদি হতো নারী সাহাবির মতো
মূল :	ড. হানান লাশিন
অনুবাদ :	আব্দুল্লাহ মজুমদার
সম্পাদনা:	আবুল হাসানাত কাসেমী, আব্দুল্লাহ মাহমুদ
বানান ও ভাষারীতি :	যাহিদ আহমাদ, এইচ. এম. সিরাজ
প্রচ্ছদ :	সমকালীন গ্রাফিক্স টীম

জীবন যদি হতো নারী সাহাবির মতো

সমকালীন প্রকাশন

জীবন যদি হতো নারী সাহাবির মতো

ড. হানান লাশিন

প্রথম প্রকাশ

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

একমাত্র পরিবেশক

চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 186.00, US $ 10.00 only.

ISBN: 978-984-94844-3-1

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ফোন : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

আয়িশা, খাদিজা, ফাতিমা ও আসমাকে যারা ভালোবাসে, তাদের প্রতি।

তুমিও হয়ে ওঠো একজন নারী সাহাবির মতো। এ পথে চলতে গিয়ে অসাধারণ যে অনুভূতি তোমার হবে তা উপভোগ করো। ঈমানের স্বাদ, আনুগত্যের মজা থেকে অঞ্জলি ভরে নাও। জীবনপথে সুখ-সৌভাগ্যের বাজারটা অতিক্রম করো। আর শেষ কথা হলো, কখনো সৎসঙ্গ ত্যাগ করবে না, যাদের সাথেই থাকবে; তোমার মুক্তি সে পথেই হবে।

—ড. হানান লাশিন

প্রকাশকের কথা

পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হতে আমাদের পাড়ি দিতে হয় কণ্টকাকীর্ণ পথ। ছেড়ে আসতে হয় সকল পিছুটান। ইসলামের সুমহান আদর্শে নিজেকে সাজাতে গেলে অনেক প্রিয় মানুষ, প্রিয় বন্ধু, প্রিয় সুহৃদ আমাদের থেকে দূরে চলে যায়। চারপাশটা আমাদের জন্য হয়ে যায় একটা বৈরী পরিবেশ। তবুও অনন্ত সুখের আশায়, মহান রবের সন্তুষ্টি কামনায়, প্রিয় রাসুলের পদাঙ্কিত পথে হাঁটার মানসে আমরা বদলে যাই। ছেড়ে আসি প্রিয় মানুষ, প্রিয়জন, প্রিয় সময়।

যখন মক্কা নগরীতে একজন মহামানবের আবির্ভাব হলো, যখন আসমান থেকে তার ওপর নেমে এলো এক ঐশী আলোক রেখা, তখন দলে দলে মানুষ সেই মহামানবের ডাকে সমবেত হতে শুরু করল। একটি অত্যুজ্জ্বল আলোর পানে ছুটে আসতে লাগল তৃষিত সব প্রাণ। সেই তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধিত প্রাণের মানুষগুলোর মাঝে, বিশাল একটি সংখ্যা ছিল নারীদের। নারী সাহাবিদের। রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না। নবিজি যখন এক চরম, পরম ও মহাসত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করলেন, তখন অনেকের মতো চারদিক থেকে তৃষিত হৃদয়ে ছুটে এলো নারীদের দলও। তারাও বরণ করে নিল সত্যের পেয়ালা। যে অমৃত নবিজি ধারণ করে এনেছেন হেরা পর্বত থেকে, সেই অমৃত পান করতে উদগ্রীব হয়ে পড়লেন তারাও।

কিন্তু, সত্যের এই মিছিলে যোগদান তাদের জন্য সহজ ছিল না মোটেও। নবিজির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে তারা হয়েছেন ঘরহারা। হারিয়েছেন প্রিয় মানুষ, প্রিয় মুখ। সত্যকে নিজেদের জীবনে ধারণ করতে গিয়ে তারা হিজরত করেছেন। ছেড়ে

এসেছেন প্রিয় জন্মভূমি। এমনকি হাসিমুখে মৃত্যুর মিছিলেও তারা অংশ নিয়েছেন। তবু যে অমৃত তারা পান করেছেন, যে রঙে রাঙিয়েছেন জীবন, যে সুরে আবগাহন করেছেন তনুমন, সেই অমৃত, সেই রং, সেই সুর থেকে তারা একচুল পরিমাণও বিচ্যুত হননি। এতটাই দৃঢ় আর অবিচল ছিল তাদের ঈমান।

ঐশী আলোর ঝলকানিতে সত্যের পেয়ালা পান করে জীবনকে আলোকময় করেছেন যে রমনীগন, যে সুর আর লহরির মাঝে তারা হারিয়ে গেছেন, সত্যের পথে হাঁটতে তারা যে ত্যাগ-তিতিক্ষা, যে বিসর্জন দিয়েছেন, তা-ই উপজীব্য হয়ে উঠে এসেছে আমাদের *জীবন যদি হতো নারী সাহাবির মতো* বইতে। সত্য আর সুন্দরের জন্য তাদের কুরবানি, তাদের আত্মত্যাগের গল্পগুলো থেকে আমরা খুঁজে নেব আমাদের জীবনের রসদ। রাঙিয়ে নেব আমাদের জীবন-অধ্যায়। শুধরে নেব ভুল। জাগিয়ে তুলব বিস্মৃত অন্তর।

বইটির লেখক ড. হানান লাশিন। অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই আবদুল্লাহ মজুমদার। আল্লাহর কাছে করজোড়ে প্রার্থনা—তাদের উভয়কেই তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করুন এবং এই বইটিকে মানুষের জন্য বদলে যাওয়ার নিয়ামক হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

অনুবাদকের কথা

সকল স্তুতি কেবল মহান আল্লাহ তাআলার জন্য। অজস্র নিআমত দ্বারা তিনি শোভিত করেছেন আমাদের জীবন। জীবনের পরতে পরতে তাঁর শত করুণাধারায় আমরা সিক্ত হয়েছি বারবার। সেই অফুরান নিআমতের একটি হচ্ছে 'জীবন যদি হতো নারী সাহাবির মতো' গ্রন্থটি আজ পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পারা।

প্রিয় শাইখ আব্দুল হামিদ ফাইযি রচিত অনবদ্য এক কবিতা দিয়ে শুরু করছি—

বিশ্বাসের গোলাঘরে

আগুন তোমার

লোলুপ থাবা হায়েনার

ধেয়ে আসছে

তোমার ধ্রুব প্রত্যয়ে

ঘুন লেগেছে

শকুনির অশুভ চাহনি

গিলে খেতে চায়

তোমার সবটুকু অস্তিত্ব

তোমার সুরক্ষিত ঐতিহ্যে
ফাটল ধরেছে
সুনামির ঝঞ্ঝা বায়ু
বেগে আসছে ভাসিয়া দিতে
তোমার সবকিছু—

তোমার প্রাচীর ঘেরা
নৈতিক প্রাসাদে
ডাকাত পড়েছে
ভয়ানক অস্ত্র উঁচিয়ে
সবকিছু লুটে নিতে।

হে বিশ্বাসী ললনা
তুমি নও অবলা, নও শক্তিহীনা
জাগো, রুখো
বলো, আমি বিশ্বাসী ললনা।

হ্যাঁ পাঠকবৃন্দ, এ বইটি বিশ্বাসী নারীদের উদ্দেশ্যে রচিত।

মুমিন নারীরা আমাদের মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই গড়ে ওঠে সমাজ, পরিবার, দেশ ও জাতি। তাই নারীকে দূরে সরিয়ে, তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে কখনো জাতিগত উন্নয়ন সম্ভব নয়। ক্ষণিকের এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে একজন ঈমানদার পুরুষের স্বপ্ন—আখিরাতের জন্য নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করে তোলা। একইভাবে, একজন ঈমানদার নারীর কাছে কেবল পারলৌকিক চিন্তাই মুখ্য থাকে, বাকি সব চিন্তা ধীরে ধীরে গৌণ হয়ে যায় কালের আবর্তনে।

পরকালীন সাফল্য পেতে, জীবনকে আরও সুন্দর ও বিকশিতরূপে গড়ে তুলতে আমরা অনুসরণ করব সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ নারীদের, যারা পেয়েছেন নবিজির সান্নিধ্য ও

আল্লাহর সন্তুষ্টি। একজন মুমিন নারী তার ক্ষুদ্র জীবনটা ফুলের মতো সুরভিত ও তারকার মতো আলোকিত করতে পারে, যদি সে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে মহান রবের আনুগত্যে, যদি সে জীবনভর চলতে পারে নারী সাহাবিদের পথে। তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে জীবনকে সে প্রতিনিয়ত রাঙিয়ে নিতে পারে অনুপমরূপে।

নারীদের জন্য জান্নাত পাওয়া কতই না সহজ! প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে, রামাদানের সিয়াম পালন করে, ইজ্জত-আব্রুর হিফাযত করে এবং স্বামীর কথা মেনে চলে, সে জান্নাতের যে-কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছেমতো প্রবেশ করতে পারবে।'[১]

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আল্লাহ সুবহানাহু আমাকে অনুবাদ করার তাওফিক দিয়েছেন, সেজন্য তাঁর কাছে লাখো-কোটি শুকরিয়া। এ বইটি পড়ে কেউ যদি নিজেকে নারী সাহাবিদের পথে, বিশুদ্ধতার পথে এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারে, তবে সেটাই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

হে আমার রব, কবুল করে নিন আমার সামান্য এ প্রয়াসটুকু। বইটি যেন বিশ্বাসী নারীদের ঈমানকে আরও মজবুত করে তোলে, বইটি যেন তাদের জীবনকে আরও গতিময় করতে পারে। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল!

আল্লাহর ক্ষমার মুখাপেক্ষী

আব্দুল্লাহ মজুমদার

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং : ১৬৬৪; হাদিসটি সহিহ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : নারী সাহাবির মতো

ভালোবাসার মায়াজালে ১৭
হৃদয়ের হিজরত ২০
হৃদয়ের আলোয় ২৩
সবুজ হৃদয় ২৬
ভালোবাসার বাগান ৩০
পবিত্র ফুল ৩৩
উষ্ণ ভালোবাসা ৩৬
তিনি ও চাঁদ! ৩৯
মিষ্টি জুঁই ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : অনুভবে অনুভূতি

এই তো প্রথম! ৫৩
প্রিয়জন আলিঙ্গনে ৫৬
ভালোবাসার ছাপ ৬০

ফেরেশতাদের আলাপনে ৬৩
জান্নাতের ট্রেন ৬৬
পর্দা করে তবে... ৬৯
সেই মুহূর্তগুলি ৭৪
হায়, যদি আমি পুরুষ হতাম! ৭৭
চমৎকার অনুভূতি ৮০
মার্জিনের ওপাশে ৮৩
কতই না ভালো হতো! ৮৬

তৃতীয় অধ্যায় : সুখের পানে

শুভ্র ফুল ৯১
স্বপ্নের রাজকুমার ৯৩
গোলাপের পাপড়িগুলো ৯৭
সুখের বাজার ৯৯
অনেকে আছে ১০১
স্থগিত স্বপ্ন ১০৩
তুমি কত সুন্দর ১০৭
সমুদ্র, তোমায় ধন্যবাদ! ১১০
বিয়ে ও রুলার ১১২
ভাবনার শেষ থেকে ১১৫
শেষ কথা **১১৮**

প্রথম অধ্যায়

নারী সাহাবির মতো

ভালোবাসার মায়াজালে

জীবন থেকে একেকটা দিন চলে যায়। রেখে যায় তারিখ নামক কিছু সংখ্যা। ফিরে তাকিয়ে হিসেব করি, কতটা বছর পাড়ি দেওয়া হলো! আর কতটাই-বা বাকি আছে! মুহূর্তরা আসে, যায়—কখনো আনন্দের মোড়কে, কখনো আফসোস আর বিষণ্ণতার বার্তা নিয়ে। এভাবেই সময় কেটে যায়। নিস্তরঙ্গ জীবনে কখনো-বা আবেগের জোয়ার আসে মনে। বলে ফেলি, 'হায়! সাহাবিদের যুগে জন্মাতাম যদি!'

তাই কি কখনো হয়? সাহাবিদের যুগে জন্ম—সে কি আর সম্ভব! তবু এ প্রত্যাশা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই সিরাতের পাতায় পাতায়। নাই-বা হলাম তাদের সাথি, তাদের চিনে নিতে, জেনে নিতে তো বাধা নেই! জানতে গিয়ে ভালোবেসেছি উমারের ন্যায়পরায়ণতা, সিদ্দিকের কোমলতা, আলির প্রজ্ঞা, উসমানের বিচ্ছুরিত নূর আর বিলালের সুললিত কণ্ঠস্বর। রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

শুধুই কি তা-ই? সে সময়ের মহীয়সী সব নারী সাহাবির কথাই-বা ভুলি কী করে! তাদের জীবনও যে প্রজ্বলিত নক্ষত্রের মতো আলো ছড়ায়! তাদের জীবনী যদি গভীরভাবে দেখতাম, তাহলে হয়তো আমূল বদলে যেতাম আমরা। প্রতিটি মুসলিম নারী হতাম এক-একজন নারী সাহাবিদের মতো।

আজ তেমনই এক নক্ষত্রের ন্যায় নারী সাহাবির গল্প বলব। বলব এক অনুগত কন্যার কথা।

ছোটবেলায় বাবার সাথে আমাদের সম্পর্কটা কেমন ছিল মনে আছে? বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেই সালাম জানাতে দৌড়ে যেতাম। হাতের তালুতে চুমু এঁকে দিতেন তিনি। কোলে নিয়ে মুখে মিষ্টি তুলে দিতেন। অপলক তাকিয়ে দেখতেন মেয়ে তার মিষ্টি খাচ্ছে। গভীর মমতায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, মুচকি হাসতেন। কালের পরিক্রমায় আমরা বেড়ে উঠেছি। বাবার স্নেহ ভালোবাসার রূপ বদলেছে। মূলটাও কি বদলেছে? নিশ্চয়ই না!

যে নারী সাহাবির গল্প বলব, তিনিও ছিলেন পিতার স্নেহ আর ভালোবাসায় ধন্য। তিনি হলেন আসমা বিনতু আবি বকর। হিজরতের সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর পিতা আবু বকর লুকিয়ে ছিলেন সাওর পর্বতে। সে সময় তাদের জন্য পাথেয় বহন করে নিয়ে যেতেন আসমা। শত্রু আবু জাহল আসমার পিতা আর নবিজির অবস্থান জানতে মরিয়া তখন। আসমাকে জেরার মুখোমুখি হতে হলো। কিছুই বলেননি তিনি। ছিলেন হকের পথে অবিচল, অটল। জিজ্ঞাসাবাদ নীরবেই পার করে দিয়েছিলেন। আর তাই তো আবু জাহল রেগে চলে গিয়েছিল, সজোরে থাপ্পড় বসিয়েছিল আসমার গালে।

কী চমৎকারভাবেই না আসমা তার বাবার গোপনীয়তা রক্ষা করে গেছেন! আমরা মেয়েরা যখন সন্তানের ভূমিকায়, তখন তিনি হতে পারেন আমাদের আদর্শ। কষ্ট সইতে হলে সইব, ঠিক আসমা বিনতু আবি বকরের মতো। তবু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে হিফাযত করে চলব। অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব, পবিত্র রাখব। 'ভালোবাসা'র নামে ছেলেরা যে মিথ্যে বন্ধুত্বের হাতছানি দেয় তা থেকে সাবধান হব।

এভাবে একদিন দেখব—বাবার কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটা বেড়ে গেছে। এমনকি বেড়ে গেছে আল্লাহর প্রতিদানও। আমরা হয়ত জানবও না, পিতার আনুগত্যে পরম করুণাময় আমাদের ভালোবাসতে শুরু করেছেন, ফেরেশতারাও ভালোবাসতে শুরু করেছেন তাঁরই ইশারায়। তাই বলছি, এদিক-সেদিক থেকে যত ফিতনাই ধেয়ে আসুক না কেন, আমাদের দৃঢ় থাকা চাই। যুগ তার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে দিলেও আমাদের আসমা হয়ে থাকা চাই।

সেই আসমা, যে আসমা শুধু পিতার অনুগতই ছিলেন না, বিয়ের পর জীবনসঙ্গীর প্রেমেও মশগুল ছিলেন। তার হৃদয়-মন জানতে পেরেছিল প্রকৃত ভালোবাসার অর্থ।

স্বামী যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে ভালোবেসেছিলেন তিনি। অথচ যুবাইর ছিলেন দরিদ্র। তার ছিল একটি মাত্র ঘোড়া। আসমা ধৈর্য ধরে তা মেনে নিয়েছিলেন। ঘোড়ার দেখভাল করতেন। পানি বয়ে আনতেন। খেজুরের বীচি পিষতেন। সব ওই এক কারণে— আসমা ভালোবাসতেন তাকে। কোনোকিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ছিল না তার। তিনি ছিলেন উত্তম সহযোগী, প্রেমময়ী বিনম্র স্ত্রী। জীবিকার কষ্ট ও তীব্র বঞ্চনার মাঝেও ধৈর্যধারণকারী। আল্লাহ তাদের ওপর বর্ষণ করেছিলেন নিআমতের ফল্গুধারা।

আমাদের এমনই হওয়া চাই! যখন জীবনে একজন নেককার স্বামী আসবে, আমাদেরও নেককার স্ত্রী হওয়া চাই। আমরা হব আসমার মতো।

হৃদয়ের হিজরত

মানুষের হৃদয়টা বড় অদ্ভুত। স্থান ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে যখন খুশি, যেভাবে খুশি। মন চাইলেই এমন যুগে চলে যেতে পারে, যে যুগে সময়ের আকাশে ওড়াউড়ি করত কিছু পবিত্র হৃদয়। সেই হৃদয়েরা আলোর খোঁজে উড়তে উড়তে ছাড়িয়ে যেত মেঘমালায়।

আমরা এমনই এক নারীহৃদয়ের কাছাকাছি যাব আজ, যে নারী ঘোষণা করেছিলেন আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা। একাকী হিজরত করেছিলেন হৃদয় দিয়ে, সশরীরে। তিনি ছেড়ে গিয়েছিলেন বাবাকে। ছেড়ে গিয়েছিলেন নিজ পরিবারকে। ত্যাগ করেছিলেন অর্থসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি। সত্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে।

বলছিলাম প্রিয় উম্মু কুলসুম বিনতু উকবাহর কথা। অশান্ত হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দেয় যে দ্বীন, সেই দ্বীনকে ভালোবেসে উম্মু কুলসুম হিজরত করেছিলেন। বাবা-ভাইয়েরা তখন দুর্বল ও দাসদের অত্যাচারে লিপ্ত। অপরাধ একটাই—ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা। এমন এক পরিবারের সদস্য হয়েও নিজ পিতা উকবাহ, ভাই ওয়ালিদ আর উমারার দ্বারা এতটুকু প্রভাবিত হননি উম্মু কুলসুম। ফিরেও তাকাননি তাদের দিকে। বরং মুসলিমদের সাথেই বাকি জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আমাদেরও কি সুযোগ আছে তার মতো হবার? নিশ্চয়ই আছে। চারদিকে যখন ফিতনার জয়জয়কার; তখন কি মনটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারি না আমরা? হৃদয়টাকে

হিজরত করাতে পারি না? আমরা চাইলেই পারি। ভুলপথের দুয়ারগুলো যখন খুলে যায়, হাতছানি দিয়ে ডাকে, তখন আমরা আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগী হয়ে যাব। আসমানের পানে মাথা তুলব চোখটা বন্ধ রেখে। আল্লাহর সাথে অটুট বন্ধনে বুকে বইবে প্রশান্তির সুবাতাস।

উম্মু কুলসুমও এভাবেই হিজরত করেছিলেন। সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ঘর ছেড়ে। রওনা হয়েছিলেন মদিনার পথে। আর পেছনে ফেলে গিয়েছেন পরিবারের সম্মান, বাবার নিরাপত্তা, আত্মীয়তার সম্পর্ক। ডানে-বামে তাকিয়ে কোনো বাহন পাননি তিনি। একাকিনী পথ চলছেন। নিঃসঙ্গ যাত্রা। রাতের অন্ধকার এসে গ্রাস করেছে তাকে।

রাতে নিকষ কালো আঁধার, আর দিনে ঝলসে দেওয়া সূর্যের প্রখর তাপ। তবু পেছন ফেরেননি উম্মু কুলসুম। ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়েছিলেন তাসবিহ পড়ে। জামার কোণাটা শক্ত করে ধরে এগিয়ে গিয়েছেন। দুর্গম এ পথে তার সঙ্গী ছিল নিজেরই হৃৎকম্পন। পায়ের তলার নরম বালুও নির্দয় আচরণ করেছিল। গ্রাস করে নিতে চেয়েছিল ছোট্ট পা দুটিকে। এতকিছুর মাঝেও পথ করে এগিয়ে চলেছেন তিনি। পায়ে হেঁটে হিজরত করেছেন মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশে। পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে, হিজরত-প্রত্যাশী হৃদয় নিয়ে।

আমাদের অবস্থাও ঠিক এমন। যখন আমরা দ্বীনকে আঁকড়ে ধরি, হিজাবে নিজেকে আবৃত করে নিই, নিজের সম্মান বাঁচিয়ে চলি, জীবন কাটাই রবের আনুগত্যে; ঠিক তখনই আমাদের চারপাশটা বৈরী হয়ে ওঠে। তবু আফসোসের কিছু নেই। আমরা তো স্রষ্টার বেঁধে দেওয়া সীমার মাঝেই আছি!

আমরা যখন হারাম থেকে বাঁচতে হালালের খোঁজ করি, মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকি, পাপাচারের হাতছানিতে একটুও না টলে মুখ ঘুরিয়ে নিই, শয়তানের বিকৃত মুখে চপেটাঘাত করি, আমরা তখন সত্যিই একা, বড্ড একা! তবু আফসোসের কিছু নেই। আমরা তো ঠিক উম্মু কুলসুমের মতো একা, যিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন তার হিজরত-প্রত্যাশী হৃদয় নিয়ে।

অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছেছিলেন তিনি। চারপাশের আনন্দ-উচ্ছ্বাস ঘিরে ধরেছিল তাকে। সেই আনন্দেও ভাটা পড়েছিল। হঠাৎ তার পরিবার হাজির। তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাবি করে বসল উম্মু কুলসুমকে। তাদের

যুক্তি ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিটি। সে সন্ধিতে মক্কা থেকে আগত সকল মুসলিমকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ছিল।

দুঃখকষ্টে ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল উম্মু কুলসুমের। উৎফুল্ল হৃদয়ে সহসাই জায়গা করে নিয়েছিল তীব্র যাতনা। আসমানের দিকে হাত তুলেছিলেন তিনি। মিনতি করেছিলেন তার রবের কাছে।

আসমানে একটু নড়াচড়া। ফেরেশতারা পাখা ঝাপটাচ্ছে। বিশ্বস্ত জিবরিল আলাইহিস সালাম তার অন্তরের প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ নিয়ে আসছেন আল্লাহর বাণী—

> *যদি তাদের মুমিন নারী পাও তাহলে তোমরা কাফিরদের কাছে তাদের ফিরিয়ে দেবে না। তারা (মুমিন নারী) তাদের (কাফির পুরুষ) জন্য বৈধ না এবং তারা (কাফির পুরুষ) তাদের (মুমিন নারী) জন্য বৈধ না।*[১]

আল্লাহু আকবার! সাত আসমানের অধিপতি হিজরত-প্রত্যাশী হৃদয়টিকে শান্ত করেছিলেন। পুনরায় আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিলেন মনকে। এমনই ছিল আমাদের প্রিয় এই নারী সাহাবি।

হয়তো সশরীরে নয়, আমাদের হিজরত হবে হৃদয়ে। হৃদয়ের হিজরতে আমরা হব উম্মু কুলসুমের মতো।

[১] সূরা মুমতাহিনাহ, আয়াত : ১০

হৃদয়ের আলোয়

রেস্তোরাঁর মৃদু আলোয় আহার সারছে এক দম্পতি। সাজানো গোছানো কক্ষে দামি চেয়ার-টেবিল পাতা। পায়ের তলায় নরম তুলতুলে গালিচা। বেশ কায়দা করে ছুরির ধারালো প্রান্ত দিয়ে মাংস কেটে নেয় মেয়েটা। একদম মুখের মাপমতো। আয়েশ করে মুখে পুরে দেয় মাংসের টুকরো। একদম নিখুঁত জীবনাচার, তবু যেন কীসের অভাব!

এই আকর্ষণীয় আহারের দৃশ্য থেকে এবার চলে যাই এক নারী সাহাবির জীবনে। আনসারি এক নারী সাহাবি। তার আছে সুন্দর এক দস্তরখানা। আর আছেন প্রিয়তম স্বামী—যিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন অপলক। স্ত্রীও ফিরে তাকাতে বাধ্য হন; সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায় তাতে। চোখে চোখে কথা হয়। স্বামী তার দরদমাখা কণ্ঠে কথা বলেন স্ত্রীর সাথে। স্ত্রীও প্রেমের দহনে দগ্ধ হয়ে ভালোবাসার কণ্ঠ শোনেন।

তার স্বামী ছিলেন আনসারিদের মাঝে একজন দানশীল ব্যক্তি।

একদিনের কথা। স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘর থেকে রওনা হয়েছেন। গন্তব্য—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিস। তার পবিত্র মুখ দেখতে, অনুপম সান্নিধ্যে ধন্য হতে কে না চায়! মজলিসে পৌঁছে সাহাবি জানতে পারলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর উম্মুল মুমিনিনদের তার জন্য খাবার তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন।

‘আমাদের ঘরে কেবল পানি আছে।’ জবাব দিলেন উম্মুল মুমিনিনরা।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিক-ওদিক তাকালেন। জানতে চাইলেন, 'কে তার মেহমানদারি করবে?'

তাই তো! কে এই মর্যাদার অধিকারী হবে? কে প্রিয় নবিজির অতিথিকে আপ্যায়ন করবে? উদ্দীপনায় আমাদের নায়ক সাহাবির হৃদয়তন্ত্রী কেঁপে উঠছে বারংবার! তিনি চাইলেন সাওয়াবের অধিকারী হতে, মর্যাদা লাভ করতে। নবিজির ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি যে নিশ্চিত, স্ত্রী তাকে সাহায্য করবেই ইনশাআল্লাহ। মনে দ্বিধা না রেখেই সাহাবি বললেন, 'আমি!' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হলেন। সাহাবিও অতিথিকে নিয়ে চললেন নিজ বাড়িতে, প্রিয়তমার কাছে।

দরজায় কড়া নাড়লেন আনসারি সাহাবি। হাসিমুখে স্ত্রীকে জানালেন অতিথির কথা। পরম নির্ভরতায় বললেন, 'রাসুলুল্লাহর অতিথিকে সম্মান দাও।'

ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হয়ে গেলেন তার প্রেমময়ী স্ত্রী। ঘরের সাদামাটা দেওয়ালটাতে অর্থহীন দৃষ্টি ঘুরল কতক্ষণ। তারপর লজ্জামাখা কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমাদের কাছে শুধু বাচ্চাদের খাবারটুকুই আছে।'

সাহাবি নীরব রইলেন। তারপর মুচকি হেসে প্রত্যয়ের সাথে বললেন, 'খাবার প্রস্তুত করো। বাতিটা ঠিকঠাক করো। আর বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও।'

স্ত্রী মেনে নিলেন বিনা বাক্যব্যয়ে। 'উফ্' বললেন না। আপত্তি করলেন না। স্নেহমাখা কণ্ঠে গল্প করতে লাগলেন সন্তানদের সাথে। ঘুম পাড়িয়ে দিলেন ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই। বুকটা যেন কষ্টে ফেটে যাবার উপক্রম। কিন্তু এ অতিথি যে যেনতেন কেউ নয়! ইনি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতিথি। আর এখন তার স্বামীর অতিথি।

দিশেহারা মায়ের হৃদয় শান্ত হলো—শিশুদের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজে। ঘুমন্ত শিশুগুলোর নিঃশ্বাস যেন আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে চলেছে। স্বামীর আনুগত্যের চেয়ে রবের আনুগত্যেই যেন প্রস্তুত হয়ে গেলেন এই নারী সাহাবি।

সাজালেন সামান্য দস্তরখানা। এ দস্তরখানায় নেই কোনো দামি পেয়ালার সমাহার। বসবার জন্য নেই কোনো নরম গদি। অভিজাত গালিচাও অনুপস্থিত। দস্তরখানা বিছিয়ে স্ত্রী চলে গেলেন বাতির কাছে। বাতি ঠিক করবার ভানে নিভিয়ে দিলেন ঘরের আলো।

ওদিকে স্বামী-স্ত্রী সঙ্গ দিলেন অতিথিকে, আবছায়া অন্ধকারে অদৃশ্য খাবার খাওয়ার ভঙ্গিতে। নিখুঁত ছিল না কিছুই। তবু সুখ ছিল অন্তহীন।

রাত চলে গেছে। তৃপ্তিসহকারে খেয়েছেন অতিথি। বাকিরা ক্ষুধার্ত, আস্বাদন করেছেন ত্যাগের মিষ্টি স্বাদ। পরদিন স্বামী গেলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জানালেন, আল্লাহ তাদের কাজে বিস্মিত হয়েছেন, ভালোবেসেছেন।

ফিরে আসি নিজেদের জীবনে। আমাদের ঘরটাও হয়তো সেই নারী সাহাবির ঘরটির মতোই। হয়তো দামি আসবাব নেই। নেই দামি বাসনকোসন। আমাদের স্বামীও হতে পারে সাদাসিধে। সামান্য আয়ে চলে। এরই মাঝে আমরা কেন সুখ খুঁজে নিই না? দুনিয়াবি কিছুতে সুখ খোঁজার মতো বোকামি আর কী হয়! সুখ তো রবের সন্তোষে, যে সন্তোষ আসে স্বামী-স্ত্রীর একাগ্রতায়!

সেই নারী সাহাবির কথা ভাবি। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে যিনি জ্বেলে দিয়েছিলেন হৃদয়ের আলো। অল্পে তুষ্ট থেকে আমরাও না-হয় হৃদয়ের আলোয় আলোকিত করি চারদিক! আমরাও না-হয় হয়ে যাই সেই নারী সাহাবির মতো!

সবুজ হৃদয়

হৃদয় কখনো প্রেমে পড়ে, উদ্বেলিত হয় ভালোবাসায়। হৃদয় কখনো ব্যাকুল হয়ে ওঠে, জাগ্রত হয় গভীর ব্যথায়! দ্বীনের আলোয় আলোকিত হৃদয় চায় না নিচে নামতে। এ হৃদয় হারাম থেকে বিরত থাকতে চায়। নিজেকে রাখতে চায় পবিত্র। কিছু মানুষের হৃদয়গুলো সবুজ-শ্যামল। সেই সব হৃদয়ে হারাম কিছু আঘাত হানতে পারে না।

আমাদের গল্পটা এমন হৃদয় নিয়েই। দুটি পবিত্র হৃদয়ের ভালোবাসার গল্প। তারা উভয়েই এক বাড়িতে বেড়ে উঠেছে। ছেলের সাথে মেয়ের বাবার আত্মীয়তা ছিল। হালাল পন্থায় স্বপ্নপূরণের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল ছেলেটা।

আর সেই মেয়েটা? অনুগ্রহে ভরপুর গৃহে শান্ত মনে বিচরণ করত সে। তাই দেখে উজ্জ্বল হতো বাবার মুখ। নরম পা ফেলে সে এগিয়ে যেত বাবার দিকে। প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে বাবার পবিত্র হাতে চুম্বন করত। বাবাও তাকে জড়িয়ে ধরে উত্তম দুআ করে দিতেন। সে বাবার অনুগত। বাবাও তার প্রতি খুব খুশি, প্রচণ্ড ভালোবাসেন মেয়েকে। তাই তো তাকে 'মা' বলে ডাকেন!

মেয়ের বয়স আঠারোর কাছাকাছি। কী সুন্দর মেয়েটা! আমরা কি জানি, সেই মেয়েটি কে? মেয়েটি ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা, প্রিয় নবিজির কন্যা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার জন্য একের পর এক প্রস্তাব আসে। আবু বকর এলেন। উমার এলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ফিরিয়ে দেন বিনয়ের সাথে। হয়তো কন্যার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিটিকে

তিনি ভেবে রেখেছেন! সেই উপযুক্ত ব্যক্তিটি আর কেউ নন! আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু, নবিজির চাচাতো ভাই।

আলি দূর থেকে দেখে যেতেন সব। হৃৎকম্পন বেড়ে যেত তার। একবার মনকে ধরে রাখছেন, তো আরেকবার তা বিদ্রোহ করে বসছে! একপর্যায়ে আর না পেরে পবিত্র জবানে চেয়ে বসেন ফাতিমাকে; নিজের স্ত্রীরূপে, নয়নজুড়ানো সঙ্গিনীরূপে। সেদিন আলির বুকের ভেতরে চলছিল হাতুড়িপেটা। তবু সলজ্জ হয়ে বসেছিলেন রাসুলের পাশে। মুখে কোনো কথা নেই। জিহ্বা থেমে গেছে। ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন যেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন লজ্জায় আলি কিছু বলতে পারছে না। দয়ার্দ্র চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন তিনি। নরম সুরে শুধালেন, 'ইবনু আবি তালিবের কী প্রয়োজন?' আলি মৃদু স্বরে জবাব দিলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে ফাতিমার কথা বলতে চাইছিলাম।'

কেমন করে যে কথাটা বলে ফেললেন আলি! হৃদয় কেঁপে চলছে অনবরত।

ক্ষণিকের নীরবতা। উৎকণ্ঠায়, অপেক্ষায় সে নীরবতাকেও অসীম মনে হচ্ছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে নীরবতা ভাঙলেন অবশেষে। নরম সুরে বললেন, 'মারহাবান ওয়া আহ।'

আলির হৃদয়ে সে কথা প্রবাহিত হলো শীতল ঝরনাধারার মতো। হৃদয় ধন্য হলো। ধন্য হলো সকল আবেগ-অনুভূতি। আলি বুঝে গেলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনের কথা। তিনিও যে আলিকে জামাতা হিসেবে দেখতে চান! এই ছিল সূচনা।

বেশ কদিন পর আলি আবারও গেলেন প্রস্তাব নিয়ে। তখনই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল। মোহর ছিল একটি বর্ম। আলির মালিকানায় থাকা হুতামি নামক এক বর্ম! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে সাধ্যাতীত কিছু চাননি। অনুষ্ঠান করেননি গোটা শহর আলোকিত করে। ফাতিমাও পরেননি হীরক খচিত ঝলমলে পোশাক। অন্য মেয়েদের সাথে নিজেকে তুলনায় যাননি। চাননি কোনো জাঁকজমক। অহেতুক সব বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত ছিল তার বিয়ে। বিয়ে তো কোনো কেনাবেচা নয়। নয় কোনো ব্যাবসায়িক চুক্তি।

ফাতিমা এখন আলির ঘরের রানি! সবাই খুশি। খুশি না হয়ে কি পারে? এ যে রাসুলের চোখের মণির বিয়ে! আনসারি সাহাবিরা আয়োজন করল ওয়ালিমার। আনন্দঘন দিনটাতে ছড়িয়ে পড়ল পরিশুদ্ধ হৃদয়ের সুবাতাস।

ওয়ালিমা[১]য় একত্রিত হলো নানা শ্রেণির মানুষ। এই উত্তম বিয়ের আনন্দে কে না শরিক হতে চায়! ইসলামি বিয়ের পরিবেশ তো এমনই! সাদামাটা অথচ আনন্দঘন আয়োজন। যে ঘরে বিয়ে হলো, তাতে ছিল না কোনো দামি আসবাব। অতিথিদেরও অভ্যর্থনা জানানো হয়নি দামি গালিচায়। দামি পাথর, বর্ণিল ছবি—কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি ছিল না সেখানে। ছিল শুধু একটা বিছানা, খেজুর পাতার বালিশ, আর চামড়ার পানপাত্র।

এই তো বাড়ি! কী পবিত্র সেই বাড়ি!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গেলেন বর-কনের কাছে। পানি দিয়ে অজু সেরে সেই পানি ছিটিয়ে দিলেন আলির শরীরে। তারপর বললেন, 'আল্লাহ! আপনি তাদের মাঝে বরকত দিন। তাদের ওপর বরকত বর্ষণ করুন। তাদের বংশেও বরকত দান করুন।'

ফাতিমা এগিয়ে গেলেন সলজ্জ পায়ে। সুতীব্র লজ্জায় কাপড়ে হোঁচট খেয়ে পড়েই যাচ্ছেন যেন! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার শরীরে পানি ছিটিয়ে দিলেন। দুআ করে বললেন, 'ফাতিমা, আমার পরিবারের উত্তম মানুষটার সাথে বিয়ে দিলাম তোমায়!'

পিতা হয়ে কন্যার বিয়েতে বরকতের দুআ করে দিলেন, জানিয়ে দিলেন উত্তম ব্যক্তি বাছাইয়ে কসুর করেননি তিনি।

আনন্দে দিন কেটে যাচ্ছিল তাদের। সুন্দর সব মুহূর্ত। সময় তাদের পানে চেয়ে মুচকি হাসল। ঘর আলো করে এলো হাসান, হুসাইন, উম্মু কুলসুম আর যাইনাব। ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাবা-মা খুশি। খুশি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নাতি-নাতনিরা ছিল তার নয়নের মণি। কী সুন্দর সংসার! কী সুন্দর জীবন!

---

[১] 'ওয়ালিমা' হচ্ছে বিয়ের পর ছেলেপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান যেখানে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী ও গরিব-মিসকিনদের সাধ্যমতো আপ্যায়ন করানো হয়। বাংলাদেশে এটা 'বউভাত' নামে পরিচিত। 'ওয়ালিমা' নবিজির একটি সুন্নাহ।

এমন জীবন পেতে আমরা কেন ফাতিমার মতো হই না? তার মতো হলে হয়তো আমাদের জীবনেও আসত আলির মতো কেউ! ফাতিমার মতো লজ্জাশীল, পিতার অনুগত আর ঈমানদার হলে তবেই না আমরা আলির মতো কাউকে জীবনে পাব! আমাদের হৃদয় হোক সবুজ কুঁড়ির মতো, যা কেবল হালালের স্পর্শেই বেড়ে উঠবে। সমস্ত জঞ্জাল আর নোংরাকে এড়িয়ে আমরা হব ফাতিমার মতো!

ভালোবাসার বাগান

বাগানটা সবাই এক নামে চেনে। বিশাল বাগানে নানারকম গাছ। গাছে গাছে ফলমূল ঝুলছে মণি-মুক্তোর মতো। হাত বাড়িয়ে ফল ছিঁড়ে নেয় মেয়েটা। মিষ্টতা আস্বাদনের আগে পরখ করে নেয় এর সৌন্দর্য। শুকরিয়া জানাতে কসুর করে না সে। এসবই যে তার রবের দেওয়া নিআমত! নিজেদের বিশাল বাগানে পায়চারি করছে সে। বাচ্চারা বাগানে ছুটোছুটি করছে, হাসছে, খেলছে। চোখ জুড়িয়ে যায়। মুখে হাসি ফোটে।

অনেক দিন হলো স্বামী বাড়ি আসছে না। তবু মেয়েটার মনে এতটুকু খেদ নেই, আনন্দের কমতি নেই। হৃদয়টা তার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। আকাশের মতো বিশাল হয়ে সবাইকে আপন করে নিচ্ছে, কাছে টেনে নিচ্ছে এক অপরিসীম মমতায়। ঠিক বাগানটার মতো। বাগান যেমন শত শত খেজুর গাছ ধারণ করে নিয়েছে নিজের বুকে!

মদিনার প্রত্যেক ব্যাবসায়ীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এই সব চমৎকার খেজুর। সুবিশাল প্রাসাদ, সৌন্দর্যমণ্ডিত বাগান—সবই ছিল তাদের আলোচনার বিষয়। মেয়েটাও এ বাগানকে ভালোবেসেছিল খুব।

এরই মাঝে ঘটে গেল এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। যার সাক্ষী হয়ে রইল মেয়েটা। সাক্ষী হয়ে রইল সম্মানিত ফেরেশতারা। সাক্ষী হয়ে রইল উপস্থিত সবাই।

ঘটনার শুরু এক বালকের অস্ফুট কান্নার আওয়াজে। বালকটি কাঁদছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন মেয়েটির স্বামী আবুদ-দাহদাহ, সুবিশাল সেই বাগানের মালিক। জানতে পারলেন বালকটি ইয়াতিম।

হৃদয় গলে গেল তার। বালকের জন্য কিছু একটা করতে ব্যাকুল হলেন তিনি।

ইয়াতিম বালক কান্নাজড়িত কণ্ঠে নবিজিকে তার কষ্টের কথা জানিয়েছিল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! নিজ বাগানের চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ করছিলাম আমি। কিন্তু প্রতিবেশীর একটা খেজুর গাছ আমার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনুরোধ করলাম আমাকে যেন খেজুর গাছটা দিয়ে দেয় অথবা বিক্রি করে দেয়। সে রাজি হলো না।'

এবার প্রতিবেশীকে তলব করা হলো। স্বয়ং আল্লাহর রাসুল তাকে অনুরোধ করলেন গাছটা দান করে দিতে, নতুবা বিক্রি করে দিতে। সামান্য এক খেজুর গাছই তো! ছেলেটা যে ইয়াতিম! ওদিকে প্রতিবেশী নাছোড়বান্দা। আবারও বালকের চোখে অশ্রুর ঢল। বিনীত চাহনিতে নবিজির ফয়সালার অপেক্ষায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার নতুন প্রস্তাব দিলেন, 'এটা বিক্রি করো; বিনিময়ে জান্নাতে পাবে একটি খেজুর গাছ।'

এত সুন্দর প্রস্তাব! নিশ্চয়ই সে এখনই গ্রহণ করে নিবে! সুসংবাদ শোনার জন্য উন্মুখ সবাই। সবাইকে অবাক করে দিয়ে আবারও অসম্মতি জানাল সেই প্রতিবেশী।

বালক দুঃখ-শোকে কাতর। প্রতিবেশী বসে আছে সেখানেই। বেশ কয়েক জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে। কিছু চোখে বিস্ময়, কিছু চোখে ক্রোধ, আবার কিছু চোখে তিরস্কার। সবকিছু উপেক্ষা করে সে নিজের মতে অবিচল।

আবুদ-দাহদাহর অন্তর খুলে গেল যেন! জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী হয়ে নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি যদি খেজুর গাছটা কিনে ছেলেটাকে দিয়ে দিই তবে কি জান্নাতে একটি খেজুর গাছ পাব?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন। এবার আবুদ-দাহদাহ ফিরলেন লোকটার দিকে। তাকে বললেন, 'আপনি কি আমার বাগানটা চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'তবে আমার বাগানের বিনিময়ে আপনার খেজুর গাছটা দিয়ে দিন।'

বেচাকেনা হয়ে গেল। দুনিয়ার বাগানের সাথে আখিরাতের বাগানের। আবুদ-দাহদাহ ছুটে চললেন নিজ গৃহে। বুকের ধুকপুকানি ছাপিয়ে যাচ্ছিল তার পদচারণাকে।

স্ত্রীকে ডাকলেন। সে ডাক প্রতিধ্বনিত হলো মদিনার প্রাচীরে প্রাচীরে।

‘উম্মুদ দাহদাহ! বাগান থেকে বেরিয়ে এসো। এ বাগান আল্লাহর জন্য।’

উম্মুদ দাহদাহ বেরিয়ে এলো নিজের জগৎ থেকে। হাত থেকে ফেলে দিল সব ফলমূল। বাচ্চাদের মুখ থেকে মুছে দিল খাবারের অবশিষ্ট দাগ। হৃদয় তার স্বামীর আদেশ পালনে উদগ্রীব, রবের সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যাকুল। কোনো প্রশ্ন করলেন না তিনি। কোনো আপত্তিও পেশ করলেন না। সন্তুষ্ট মনে স্বামীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন। এ সিদ্ধান্ত যে তাদের রবেরই জন্য!

উম্মুদ দাহদাহ বেরিয়ে এলেন দুনিয়ার বাগান থেকে। এগিয়ে চললেন আখিরাতের বাগানের দিকে।

সফল সেই ক্রয়বিক্রয়! উত্তম সেই সন্তুষ্ট স্ত্রী! যে স্ত্রী তার স্বামীকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করেন। যে স্ত্রী স্বামীর সিদ্ধান্তে তিরস্কার করেন না; এমনকি বাগানটা প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও!

আমাদেরও দুনিয়ার বাগান ছেড়ে বেরিয়ে আসা দরকার, তা সে যত সুন্দরই হোক না কেন! প্রিয় জিনিসগুলো রবের সামনে পেশ করবার এই তো সময়! উম্মুদ দাহদাহর মতো আমরাও এগিয়ে চলব আখিরাতের বাগিচার দিকে। আমরাও হয়ে যাব উম্মুদ দাহদাহর মতো।

পবিত্র ফুল

এক পবিত্র ফুলের গল্প শোনাব আজ; যে ফুলের সৌরভে মাতোয়ারা হবার অধিকার সবার ছিল না। সেই পবিত্র ফুলের মা ছিলেন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা, আর বাবা প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সেই ফুল যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহা।

যাইনাবকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে দিয়েছিলেন তার খালাতো ভাইয়ের সাথে। নাম তার আবুল আস ইবনুর রবী'। বিয়ের পর তিনি পেলেন এক ভালোবাসার ফুল, যার সুধা পানের অধিকার কেবল তারই।

একসময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘাড়ে নবুওয়াতের দায়িত্ব এলো। প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু করলেন তিনি। আর তাতেই কাফেররা একাট্টা হয়ে গেল নবিজির বিরুদ্ধে। উঠে পড়ে লাগল তাকে কষ্ট দিতে। আবুল আসের কাছে গেল তারা। সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের পেশ করে প্রস্তাব দিল, তিনি যেন যাইনাবকে তালাক দিয়ে এদের কাউকে বিয়ে করে নেন।

আবুল আস তার ফুলকে ছেড়ে যেতে চাননি। পবিত্র সে ফুল, ভালোবাসার ফুল। কেমন করে ছেড়ে দেবেন তাকে? বরং কাফিরদেরই ফিরিয়ে দিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তাকে তালাক দেবো না। কখনো তাকে ছেড়ে যাব না। তোমরা আমাকে আরবের যত মেয়েই দাও না কেন!'

সত্যিই তো! কী করে তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারেন? তিনি যে সেই পবিত্র ফুলের অমিয় সুধা পান করেছেন!

দিন চলে যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করেন। যাইনাব রয়ে যান নিজ স্বামীর কাছে। স্বামী তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি।

বদরের যুদ্ধের কথা। সে সময় আবুল আস কাফিরদের সাথে যোগ দিলেন। হলেন যুদ্ধবন্দি। মক্কাবাসীরা তাদের জন্য মুক্তিপণ পাঠাল। যাইনাব তার সবকিছু জমা করলেন। এমনকি মা খাদিজা গলার যে হারটা তাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেটাও!

সব পাঠানো হলো। হাজির করা হলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে। হারটা দেখেই চিনে ফেললেন তিনি। হৃদয় গলে দ্রবীভূত। মনে পড়ে গেল প্রিয়তমা স্ত্রীর কথা। সাহাবিদের বুঝতে দেরি হলো না। তারা আবুল আসকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেইসাথে ফিরিয়ে দিলেন মা খাদিজার হার-সহ অন্যান্য মুক্তিপণ।

আবুল আস ওয়াদা দিয়ে গেলেন, বাবার কাছে হিজরতের জন্য স্ত্রীকে ছেড়ে দেবেন তিনি। আবুল আস মক্কায় ফিরলেন মুক্তি পাবার সুখস্মৃতি নিয়ে। আর যাইনাব? স্বামীর হৃদয়কে বশ করে মদিনার পথ ধরলেন। গর্ভে তখন একটি সন্তান। সে সন্তানকে হারাতে হলো যাত্রাপথেই। বুকের ভেতর এক ক্ষতবিক্ষত হৃদয়। এ হৃদয়ের কান্না থামবার নয়।

দিনের পর দিন চলে যায়। অদৃশ্য প্রেমের জালে আটকা পড়ে আছেন দুজন। আবুল আস ব্যাবসা করতে বের হন। তার কাফেলা বন্দি হয় মুসলিমদের হাতে। তিনি পালিয়ে ছুটে আসেন মদিনায়। কড়া নাড়েন যাইনাবের দরজায়। হৃদয়ের স্পন্দনে কড়া নাড়ার আওয়াজ ঢেকে গিয়েছিল সেদিন।

আবুল আস নিরাপত্তা চেয়ে বসেন তার পবিত্র ফুলের কাছে, ভালোবাসার ফুলের কাছে। যাইনাব তাকে ঘরে জায়গা দিয়ে মসজিদে বেরিয়ে আসেন। ঘোষণায় জানিয়ে দেন নিরাপত্তা দিয়েছেন আবুল আসকে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্নেহভরা কণ্ঠে মেয়েকে নসীহা করেন, 'তার উত্তম আথিতেয়তা করো। তবে সে যেন তোমার কাছে না ঘেঁষে। তুমি তার জন্য হালাল নও।'

সলজ্জ কণ্ঠে যাইনাব জানান, 'তিনি তো তার অর্থকড়ি ফেরত চাইতে এসেছেন।'

নিজ গৃহে ফিরে যান যাইনাব। রবের আনুগত্য করে, বাবার কথা মেনে নিয়ে। একান্তে দুআ করে যাচ্ছিলেন দয়াময় আল্লাহর কাছে। তিনি যেন তার প্রিয়তমকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দান করেন।

যাইনাব প্রিয়তমের মুখোমুখি হলেন। নিজের সৌরভে মাতোয়ারা হতে দিলেন না, সুধার পাত্র ছুঁতে দিলেন না। না যাইনাব তার জন্য হালাল, না তিনি যাইনাবের জন্য হালাল।

আবুল আস যাইনাবের থেকে সব অর্থকড়ি নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। মনে মনে ভাবছিলেন ইসলামের মাহাত্ম্যের কথা। সবাইকে অর্থকড়ি ফিরিয়ে দিয়ে তিনি আবারও ছুটে চললেন মদিনায়। শাহাদাহ পাঠ করলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এসে।

অবশেষে বসন্ত নেমে এলো। পবিত্র ফুলের সুবাসে সুরভিত হলেন দুজনে।

যাইনাব নিজেকে ধরে রেখেছিলেন। তার সুধা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন হালাল একজনের জন্য। অপেক্ষা করছিলেন আল্লাহর অনুমতির।

আমরা তার মতো হয়ে যাই না কেন? যতক্ষণ না দ্বীনদার জীবনসঙ্গীর দেখা মিলছে, নিজের সুবাস কাউকে পেতে দেবো না। হৃদয়-মনে প্রেমের ঝংকার উঠলেও নিজেকে ধরে রাখব। যেভাবে যাইনাব ধরে রেখেছিলেন। তার মতো হয়ে যাব আমরা। পবিত্র ফুলের মতো।

উষ্ণ ভালোবাসা

দিনগুলো সব একই রকম। রাতেও তেমন হেরফের নেই। এরই মাঝে কিছু সময় আসে, যা মনের মণিকোঠায় স্মৃতি হয়ে রয়ে যায়। খুব সাধারণ এক দিনে বোনের মাথায় মাথা রেখে খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছেন কখনো? অথবা ঘর গুছাতে গিয়ে ফিসফিসিয়ে কথা? কখনো পছন্দের খাবারটা ভাগাভাগি করে খেয়ে নেওয়া। কিংবা খুব প্রিয় জিনিসটা বোনের থেকে উপহার পেয়ে যাওয়া।

যার বোন আছে সে জানে। সে-ই জানে কী করে বোনের ভালোবাসার পরশে সাধারণ দিনগুলি অসাধারণ হয়ে ওঠে। কখনো রাতের গল্পগুলো দীর্ঘ হয়। মোড় নেয় ভিন্ন কাহিনিতে। স্বপ্নেরা উড়তে থাকে। ভালোবাসা গভীর হয়। বোন থাকলে জীবন এমনই। ভালোবাসা আর পবিত্রতার মেলবন্ধনে অনুভূতিরা সতেজ হয়ে ওঠে।

আজ এক বোনের কথা বলব। বলব তার পবিত্র ও আনন্দঘন জীবনের কথা। বড় বোনের সাথে তিনি থাকতেন সম্মানিত গৃহে। গৃহে ছিল এক মহান আলো। না না, দুই-দুইটা আলো।

আজকের গল্প উম্মু কুলসুমকে নিয়ে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা। তার জন্ম হয় নবুওয়াত প্রাপ্তির ছয় বছর আগে। যে সময় আরবের লোকেরা কেবল ছেলে সন্তান কামনা করত, সে সময় নবিজির তৃতীয় কন্যা উম্মু কুলসুমের জন্ম। তাকে নিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই আনন্দিত। আনন্দিত তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাও।

দিন চলে যায়। মেয়েরা বড় হয়। উম্মু কুলসুম ও রুকাইয়া দুজনই বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যান। তাদের বিয়ের প্রস্তাব দেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো দুই ভাই। সে চাচার নাম আব্দুল উয্যা, সবাই যাকে আবু লাহাব বলে চেনে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভের পর ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। অতঃপর কাফের নেতৃবৃন্দ তাকে কষ্ট দেওয়া শুরু করল আবু লাহাবের পরিবারের মাধ্যমে। নবিজির কন্যাদের তালাক দিলেন আবু লাহাবের পুত্রদ্বয়। দাম্পত্যজীবন শুরুর আগেই। ধৈর্য ধরলেন উম্মু কুলসুম। ধৈর্য ধরলেন রুকাইয়া।

দিন চলে গেল। রুকাইয়ার বিয়ে হলো উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। হিজরত করে তিনি চলে গেলেন হাবশায়। প্রথমবারের মতো প্রাণের দোসরকে হারালেন উম্মু কুলসুম। হারালেন হৃদয়ের স্পন্দনকে। ছোট বোন ফাতিমা মায়াভরা চোখে তার দিকে চেয়ে আছে তখন। উম্মু কুলসুম তাকে কাছে টেনে নিলেন ভালোবাসার উষ্ণতায়।

কাটতে থাকে নৈঃশব্দের রাত। কখনো কানে আসে ছোট বোনের মৃদু হাসি। জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলো পাড়ি দিচ্ছেন তখন। মা-বাবার সাথে আবু তালিবের বাড়িতে বন্দি তিনি। খাবার নেই। অবরোধ চলছে। ঈমানের ওপর, ইসলামের ওপর অটল রইলেন বাবা-মার সাথে। কখনো অভিযোগ করেননি, করেননি কোনো অনুযোগ। ঘরের মাঝে ঠায় হয়ে ছিলেন প্রাচীরের মতো। নববি গৃহে সবাইকে উষ্ণ ভালোবাসায় আপন করে নিতে তিনি ছিলেন সদা তৎপর।

এরপর এলো এক বিষাদের দিন। ব্যথিত হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ব্যথিত হলেন উম্মু কুলসুমও। মহীয়সী খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বিদায় নিয়েছেন। এ ছিল এক তীব্র আঘাত, যে আঘাত শরীর-মন ভেঙে চুরমার করে দেয়।

তবু ধৈর্য ধরলেন উম্মু কুলসুম। মায়ের ঘরে চলতে লাগলেন তারই দেখানো পথে। দেখভাল করতে লাগলেন ছোটবোন ফাতিমার। বাবার পাশে দাঁড়ালেন উষ্ণ ভালোবাসায়, নিঃশর্ত আনুগত্যে। নরম মন নিয়ে দৃঢ়তার ভান করে রইলেন উম্মু কুলসুম। সে দৃঢ়তায়ও ভাটা পড়ল একসময়। প্রিয় বাবার শরীরে কাফিররা যখন বালু নিক্ষেপ করল, তখন আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে ধুলোবালি ঝেড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

বাবা সান্ত্বনা দিলেন, 'কেঁদো না। আল্লাহ তো তোমার বাবাকে রক্ষা করবেনই।'

এখানেই শেষ নয়। অপেক্ষা করছিল আরও এক আঘাত। রুকাইয়া অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে এলো তার। প্রিয় বোনকে হারিয়ে আবারও দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয়ে পড়লেন উম্মু কুলসুম। হার মানলেন না তবু। মায়ের বিচ্ছেদে যেমন ধৈর্য ধরে ছিলেন, তেমনি বোনের বিচ্ছেদেও ধৈর্য ধরলেন। ছোট বোন ফাতিমাকে পরম ভালোবাসায় আগলে রাখলেন বাবার ঘরে। বাবাকে সমস্ত কাজে সাহায্য করে চললেন আগের মতো। সবকিছুতেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ রইলেন।

অপরদিকে উসমান ইবনু আফফান স্ত্রী হারানোর বেদনায় কাতর, তার চেয়েও কাতর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদে। রুকাইয়ার মৃত্যুর এক বছর পেরিয়ে গেল। এ সময় উম্মু কুলসুমের সাথে তাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন প্রিয় নবিজি।

উসমান ইবনু আফফানের ঘরে দ্বিতীয় আলো হয়ে এলেন উম্মু কুলসুম। উসমানের চোখ জুড়িয়ে যায় উম্মু কুলসুমকে দেখে। উম্মু কুলসুমের চোখ জুড়িয়ে যায় উসমানের দর্শনে। স্বামীর সাথে ছয় বছর কাটে তার। সংসারে আসেনি কোনো নতুন অতিথি। এতেও তার কোনো অনুযোগ-অভিযোগ ছিল না। দৃঢ়তার সাথে ধৈর্যকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি। 'ধৈর্য'-ও তাকে ছেড়ে যেতে চায়নি। ধৈর্য তো ছিল তার আজন্ম পথ চলার সাথি, পরিচয়বাহী পতাকা।

একদিন তার শরীরেও রোগ বাসা বাঁধল। বিছানায় পড়ে ছটফট করতে লাগলেন উম্মু কুলসুম। নীরবে চলে গেলেন একসময়। ব্যথিত পিতা নিজের লুঙ্গি দিয়ে কাফনের কাপড় পরালেন তাকে। কবরের পাশে বসে কাঁদলেন অঝোরে। স্নেহময়ী কন্যার সাথে বিচ্ছেদের কান্না। স্ত্রী বিয়োগে কাঁদলেন তার স্বামী। বোনকে হারিয়ে কাঁদলেন ফাতিমা। এক জীবনে কত কষ্টের সময়! বিবাহ-বিচ্ছেদ, মা-বোনের মৃত্যু, পিতার অপমান, নিঃসন্তান দাম্পত্যজীবন, শেষ জীবনে নিদারুণ শারীরিক কষ্ট।

সব রকমের দুঃখ এক হৃদয়ে জড়ো হবার পরও সে হৃদয়ে আলোকচ্ছটা এতটুকু ম্লান হয়নি। বরং সে আলো ছড়িয়ে পড়েছিল ভালোবাসার পরশ হয়ে। আমরা আজও তাকে স্মরণ করি। অনুভব করি তার উষ্ণ ভালোবাসা। তার জীবনের গল্প শুনে ভালোবেসে ফেলি তাকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়েকে ভালোবাসি। ভালোবাসি উম্মু কুলসুমকে। বিপদে আপদে তার জীবন থেকে পাই ধৈর্যের প্রেরণা। উদ্বুদ্ধ হই উষ্ণ ভালোবাসায় সবকিছু আগলে রাখতে। আমরা হতে চাই তার মতো।

তিনি ও চাঁদ!

চোখ মেললেই যেন তাকে দেখতে পাই। স্নেহময় স্বামীর হাতে হাত রেখে তপ্ত বালুর ওপর হেঁটে চলেছেন তিনি। ক্ষীণকায় শরীরটা তার ঢাকা পড়েছে দীর্ঘাঙ্গা স্বামীর ছায়ায়। পালা করে গাধার পিঠে চড়েন তারা। কখনো কখনো দুজনেই নেমে হাঁটতে থাকেন। গাধাটার বিশ্রাম হয়। তার কোলে বাচ্চাটা ক্ষুধার তাড়নায় কেঁদেকেটে একাকার। কী করে দুধপান করাবেন বাচ্চাকে? কী উপায়ে বেড়ে উঠবে তার সন্তান? দুজনের অবস্থা তো একই রকম! মেঘ কী করে বৃষ্টি ঝরাবে, মেঘে যে জল নেই!

এসময় মাথায় মমতাভরা এক হাতের পরশ। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তার স্বামী। স্বামীর ভালোবাসা আর স্নেহের ঝরনাধারা প্রবাহিত হয় তার মনে। দুঃখ-দুর্দশা ভুলে যান। স্বামীর ঐকান্তিক সাহচর্যে প্রশান্তি অনুভূত হয়।

কী যে খরা যাচ্ছে এ বছর! ফসলহীন একটা বছর। সব ফসল শুকিয়ে গেছে। প্রাণীর বাটেও দুধ নেই। ক্ষুধার্ত পেটগুলো খাবারের অপেক্ষায়। আত্মাগুলোও শুকিয়ে গেছে যেন। দুজনের চেহারায় হতাশার ছাপ স্পষ্ট। জীর্ণশীর্ণ, বয়স্ক গাধার পিঠে চলেছেন তারা। শিশুটা তখনও কেঁদেই চলেছে। ক্ষুধার জ্বালায় শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠছে। স্নেহভরে বাচ্চার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন তিনি।

সঙ্গীসাথিরা বিরক্ত। দম্পতিটি এ কাফেলার সবচাইতে ধীর গতির যাত্রী। তাদের গাধাটাও ক্লান্তিতে ম্রিয়মাণ। শিশুর নিরন্তর কান্না শুনে মাথা তুলে চাইছে সবাই। তাদের দৃষ্টিতে তিরস্কার, নারীদের মুখে বিরক্তির প্রকাশ। দুজন সব সয়ে যাচ্ছেন অতি কষ্টে।

লোকেরা অবাক হয়ে তাকায়—লোকটা কেন এই দরিদ্র মেয়েটাকে ভালোবেসে আগলে রেখেছে? মহিলারাও বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে—এত দরিদ্র, আটপৌরে ছেলেটাকে কী করে মেয়েটা ভালোবাসে? দু-চোখ শুকিয়ে গেছে তার। আর কাঁদতে পারছেন না। তবু প্রিয়তম স্বামীর সহযোগিতা পেয়ে সিক্ত হয়ে ওঠে চোখের কোণ। চোখ বন্ধ করে ফেলেন তিনি। ধৈর্য ধরার চেষ্টা করেন ঢোক গিলে নিয়ে।

একসময় মক্কায় পৌঁছে যায় কাফেলা। নারীরা ঘরে ঘরে খুঁজতে শুরু করে দুগ্ধপোষ্য শিশু। শিশুকে দুধপান করিয়ে জীবিকা নির্বাহ হবে, প্রবাহিত হবে কল্যাণের ফল্গুধারা। সবার নজর ধনাঢ্য পরিবারের দিকে। ওদিকে সেই অসহায় দম্পতির জুটল এক ইয়াতিম শিশু। এমন শিশু পেয়ে বেশ মর্মাহত দুজন। স্বামীকে ফিসফিস করে স্ত্রী বললেন, 'যে শিশুর বাবা নেই, তার মা আমাদের কীই-বা উপকার করতে পারবে?'

অতঃপর সিদ্ধান্ত হলো এ শিশুকে রেখেই চলে যাবেন তারা। ততক্ষণে বাকি নারীরা একটা করে বাচ্চা পেয়ে গেছে। তারা কথা বলতে জানে। হাসিখুশি আলাপ জমিয়ে চেয়ে নিতে পারে। আর সেই ক্ষীণকায় নারী হালিমা—বাকি নারীদের থেকে পিছিয়ে ছিলেন যোজন যোজন। তার পদচারণা ধীর, দক্ষতাও কম। নিজের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বিভ্রান্তের মতো খুঁজছেন অবিরাম। মনে মনে ভাবনা—'কেন আমি তাদের মতো না?'

এ সময় স্বামী তার দিকে ফিরে চাইলেন। স্বামীর পেছনে হাঁটছিলেন তিনি। দয়ার্দ্র সুরে স্বামী বললেন, 'সমস্যা নেই। তুমি সেই ইয়াতিমকে নিয়ে চলো। হয়তো আল্লাহ তার মাঝেই কল্যাণ রেখেছেন।'

সত্যিই তো! যে শিশুর বাবা নেই তার কী দোষ? তার রিযিক তো দেবে তার রব! দয়া-ভালোবাসা এসব কি কেবল ধনীদেরই পাওনা! রিযিকদাতা আল্লাহ কত মহান, কতই না পবিত্র তিনি! হালিমা লজ্জা পেয়ে ফিরে গেলেন সেই শিশুর কাছে। কোলে তুলে নিলেন ইয়াতিম শিশুটিকে; যাতে খালি হাতে ফিরতে না হয়, শুনতে না হয় মুখরা রমণীদের তিরস্কার।

তিনি জানতেন না, এক রুপোলি চাঁদকে কোলে বয়ে এনেছেন। শিশুটিকে বুকে চেপে ধরে মনে হলো ছোট্ট শরীরটায় বুঝি চাঁদ এসে ধরা দিয়েছে! সেই চাঁদ-ঠিকরানো আলোয় নয়ন জুড়িয়ে গেল তার। দুঃখকষ্ট ভুলে গেলেন তিনি। শিশু-চেহারায়ও বুঝি এমন ব্যক্তিত্ব থাকে! ঝলমলে পবিত্র মুখ, নির্মল মুচকি হাসি; হালিমার

হৃদয়-মন জয় করতে আর কী লাগে! পাশে কাঁদতে থাকা নিজের বাচ্চাটাও মুহূর্তের মাঝে স্থির হয়ে গেল।

কে ছিল সেই শিশু? তিনি তো আল্লাহর প্রিয় হাবিব! প্রিয় রাসুল!

পবিত্র ও স্বচ্ছ দুধ রিযিকস্বরূপ পেলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পান করে পরিতৃপ্ত হলেন। ঘুমিয়ে পড়লেন, ছোট্ট হাতের পরশ রাখলেন হালিমার মুখে। এবার হালিমা নিজের বাচ্চাটাকে দুধপান করিয়ে ঘুম পাড়ালেন। দুজনকে পাশাপাশি শুইয়ে দিলেন। স্বামী পাশেই আছেন। তাকিয়ে আছেন অবাক বিস্ময়ে।

সুন্দর না?

খুবই সুন্দর!

মুচকি হাসিটা দেখেছেন?

কী মিষ্টি হাসি!

গন্ধ শুঁকেছেন?

একদম মিসকের মতো!

হাতের তালু দিয়ে স্পর্শ করলেন শিশুর মুখমণ্ডল! কী সম্মানজনক মুহূর্ত! তার আঙুল রাখলেন সেই ছোট্ট হাতের মাঝে। মুখটা মুখের কাছে নিয়ে এলেন। নাকে নাক ছোঁয়ালেন। তার বিশুদ্ধ শ্বাস নিজের বুকে টেনে নিলেন। কতই না সম্মান ও বরকতের ব্যাপার! এত মিষ্টি গন্ধ, ঠিক তার আত্মার মতো পরিশুদ্ধ।

চোখ দুটো বিস্ময়ে ছানাবড়া। বকরির ওলান দুধে ভরে উঠেছে। এ অবস্থায় উঠে গিয়ে দুধ দোহালেন তার স্বামী। পান করলেন মন ভরে। প্রিয়তমা হালিমার জন্যও কিছু দুধ নিয়ে এলেন। উত্তম এক রাত কাটালেন তারা।

সকাল হয়ে এলো। আলোকিত হয়ে উঠল প্রিয়তম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা। তার পবিত্র বদন মন ভরে দেখল দুজনে। চেহারা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে যেন। পবিত্র ঠোঁট দুটোতে ভেসে উঠছে মায়াময় মুচকি হাসি।

স্বামী ফিসফিস করে বললেন, 'হালিমা, তুমি কি জানো, এক বরকতময় শিশুকে পেয়েছ তুমি?'

রাসুলের চেহারার দিকে তাকালেন হালিমা, 'আমারও তা-ই মনে হয়। আশা করি, এ শিশুর মাঝেই আমাদের কল্যাণ!'

অতঃপর দুজনেই মক্কা থেকে বেরিয়ে এলেন সেই ক্ষীণকায় গাধার পিঠে চড়ে। হালিমা তার দুই হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন নবিজিকে। তখনই ঘটল বিস্ময়কর ঘটনা! গাধাটা অন্য সবার উটকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সবাই তাকিয়ে আছে অবাক বিস্ময়ে!

হালিমা হাসছেন, হাসছেন তার স্বামীও। বিস্ময়ে বলছেন, 'ইয়া আল্লাহ! কী বদান্যতা আর কী অনুপম বরকত আমাদের ওপর নেমে এসেছে!'

তা-ই তো হবার কথা! যারা অনাথ শিশুর প্রতি দয়া করে, তাদের ওপর বরকত নাজিল হবে না কেন? হালিমা ফিরে এলেন নিজ গোত্র বানু সাদের বসতিতে। জায়গাটা সবচাইতে অনুর্বর ও দুর্ভিক্ষপ্রবণ। কিন্তু তিনি যে চাঁদকে সাথে করে এনেছেন!

প্রতি সকালে তার মেষগুলো চরতে যায়। সন্ধ্যায় ফিরে আসে। মেষের দুধপান করে পরিতৃপ্ত হন তারা; অথচ বাকিরা এক ফোঁটা দুধও পায় না। এমনকি তার সম্প্রদায়ের অন্য মানুষগুলো রাখালদের তিরস্কার করে। উপদেশ দেয় হালিমার মেষগুলোর সাথে নিজেদের মেষ চরাতে।

এভাবে কেটে যায় দুই দুটি বছর। নেমে আসে সুখ-প্রাচুর্য। অবতীর্ণ হয় অপরিসীম বরকত, এক সতীসাধ্বী নারীর ওপরে। কারণ, তিনি এক অনাথ শিশুর প্রতি রহমদিল হয়েছিলেন। তাকে কোলে তুলে দুধ পান করিয়েছিলেন। সদ্ব্যবহার করেছিলেন সেই বাচ্চাটার সাথে। অবশ্য স্বামীর দেওয়া উপদেশের ফলেই। দুজনে যেভাবে শিশুটির প্রতি দয়ার্দ্র হয়েছিলেন, তাতে আল্লাহও তাদের প্রতি দয়ালু হয়েছিলেন।

এভাবে আমাদের ওপরও সুখ নেমে আসতে পারে, বর্ষিত হতে পারে বরকতের অমিয় ধারা। যদি কোনোদিন কোনো ইয়াতিম শিশুর প্রতি দয়া করি, খাইয়ে দিই নিজ সন্তানের মতো করে, পোশাক পরিয়ে দিই ঠিক তেমনি করে, যেমনটি নিজ বাচ্চাকে পরাই, পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় আমাদের অপ্রাপ্তিগুলোও ঘুচে যেতে পারে।

এমনও হতে পারে, আমাদের কারও ভাগ্যে আল্লাহ সন্তান লেখেননি। এ এক বিশাল পরীক্ষা। এর মাঝে আল্লাহর কোন অনুগ্রহ লুকিয়ে আছে কে জানে! হয়তো গর্ভে সন্তান আসেনি, তবু মাতৃত্বের চেতনা তো সুপ্ত রয়ে গেছে! কোনো এক

ইয়াতিমকে সেই মাতৃত্বের স্বাদ আমরা চাইলেই দিতে পারি।

হালিমা যে সুখ পেয়েছিলেন নবিজিকে মায়ের আদরে বড় করে, তার কি কোনো তুলনা চলে? তার মতো হবার চেস্টা করেই দেখি না! চেস্টা করি হালিমার মতো হতে।

মিষ্টি জুঁই

মানুষটার পবিত্র চেহারা প্রতি মুহূর্তেই চোখে ভাসে তার। ভালোবাসা বেড়ে যায়। উথলে ওঠে প্রেমের জোয়ার! বিয়ের পর অল্পকটা দিন হলো মাত্র। ভাবতেও পারেননি কাউকে এতটা আপন করে নেবেন। মনে হচ্ছে যেন একে অপরের সেই কবে থেকে চেনা! তার স্নেহময় দৃষ্টি, উষ্ণ কণ্ঠ, পবিত্র বদন, উত্তম চরিত্র... চোখ ফেরানো দায়!

এরই মাঝে একদিন স্বামী বললেন, 'সব গুছিয়ে নাও প্রিয়তমা! আগামীকালই আমরা চলে যাব।'

স্বামীর কথামতো কিছু কাপড় নিলেন তিনি। বুকভরা আশাকে সম্বল করে চলল প্রস্তুতি। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত; তবে তার দৃঢ় কাঁধে ভর করে ভরসা পেলেন যেন, 'দুশ্চিন্তা কোরো না, আমরা একসাথেই যাব।'

হিজরতের দিন সমস্ত শরীর আবৃত করে নিলেন জিলবাবে। হাঁটছেন সলজ্জ ভঙ্গিতে, স্বামীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে। স্বামীর প্রতি তার একগুচ্ছ ভালোবাসা আর আনুগত্যের অনুভূতি। একটা হৃদয় অনুসরণ করছে আরেকটা হৃদয়কে। এই অনুসরণেই যেন হৃদয়ের প্রশান্তি।

বলছিলাম আসমা বিনত উমাইসের কথা। নিজ দ্বীনের ওপর অটল থেকে স্বামী জাফরের সাথে হিজরত করেছিলেন হাবশা অভিমুখে। এক বিস্তৃত ধু-ধু প্রান্তর আর বালুময় মরুভূমি পেরোতে হয়েছিল তাদের। ধুলোয় ডুবে যাচ্ছিল পা জোড়া। তবু দমে যাননি। পাথেয় ছিল তাওহিদের মর্মবাণী। তাওহিদকে আঁকড়ে ধরেই হিজরত করেছিলেন তারা।

দিনে সূর্যের প্রখর তাপ। সে তাপ হেরে গিয়েছিল জাফরের আলোকিত চেহারার কাছে। স্ত্রী তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে পারেননি। রাত্রির গূঢ় অন্ধকারেও তাকিয়ে ছিলেন অনিমেষ নয়নে। তার চেহারা যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো! রাত্রির নিকষ আঁধার তা কী করে ঢেকে দেবে?

আসমার প্রবাস জীবনটা তীব্র কষ্টে ঘেরা। তবু ধৈর্য ধরেছিলেন, আগলে রেখেছিলেন আপন হৃদয়কে। দীর্ঘ রাতগুলি পাড়ি দিয়েছিলেন আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত হয়ে। পরিবার-পরিজন ছেড়ে সে সময় সঙ্গী কেবল কুরআন, সুস্তি কেবল ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ। আল্লাহ এ চির-সবুজ হৃদয়ের ওপর দয়া করলেন। স্বামীর ঔরস থেকে একটি সন্তান উপহার দিলেন তাকে। প্রথম সন্তান। জীবনের প্রথম আনন্দ। নাম রাখা হলো আব্দুল্লাহ।

ছেলে সন্তানকে কোলে নিয়ে জাফরের চেহারায় ফুটে উঠল আনন্দের রেখা। ছেলেটা দেখতে ঠিক তারই মতো। আর তিনি তো প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো। মনে পড়ে গেল নবিজির বাণী, 'তোমার আকৃতি আর চরিত্র আমার মতো।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য তার মন আনচান করে উঠল। ছেলেকে যতবার দেখেন ততবারই এ আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়। আসমাও যতবার দু-চোখ দিয়ে তার স্বামী-সন্তানকে দেখে, ততবারই মনে পড়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। তার নেক সাহচর্য পাওয়ার জন্য মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। গোটা পরিবার রাসুলকে দেখতে উন্মুখ। মনের আকাঙ্ক্ষা বন্ধ ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ধ্বনিত হয়, তীব্র থেকে তীব্রতর হয় সময়ের পালাবদলে।

দিন চলে যায়। এরই মাঝে আসমা জন্ম দিয়েছেন মুহাম্মাদ আর আওনকে। কলিজার তিনটা টুকরোকে গড়ে তোলায় শশব্যস্ত আসমা। একদিন খুশির সংবাদ এলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজিরদের মদিনায় ফেরার আদেশ দিয়েছেন। খুশিতে উড়তে চাইল মনটা। সন্তানদের নিয়ে স্বামীর পদচিহ্ন অনুসরণ করলেন তিনি। সম্বল ছিল স্বামীর প্রতি ভালোবাসা আর আনুগত্য।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা ফিরলেন প্রিয়জনদের কাছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাজির হলেন জাফর। নবিজি তাকে দেখে মুচকি হাসলেন, চুম্বন করলেন কপালে। তারপর বললেন, 'আল্লাহর কসম! জানি না, আমি কীসে বেশি খুশি—খাইবার বিজয়ে নাকি জাফরের আগমনে?'

আসমার খুশির অন্ত ছিল না। স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে ভালোবাসেন, তাকে ভালো না বেসে পারা যায়? শুধুই কি তা-ই? প্রিয় নবিজি আর নিজ সন্তানের চেহারায় কী ভীষণ সাদৃশ্য! মনে আশা রাখলেন, ছেলেটা যাতে চরিত্রেও প্রিয় নবির মতো হয়। এর চেয়ে মর্যাদার আর কী হতে পারে! কিন্তু জীবন তো অবিমিশ্র সুখের হয় না। জীবনে বিপদ আসে, পরীক্ষা হানা দেয়। আর তারা দুজনে তো কেবল জান্নাতের জন্যই বাঁচেন। বিপদাপদ আর ধৈর্য পরীক্ষায় উন্নীত হয়ে তবেই না জান্নাত!

মুসলিম সেনাবাহিনীর মুতার যুদ্ধের ঘটনা। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ আসমার প্রিয়তম, জীবনের স্পন্দন স্বামীকে শাহাদাতের জন্য কবুল করে নিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গৃহে এলেন। চেহারায় ভিন্ন কিছুর ইঙ্গিত। আসমা অনুভব করতে পেরেছিলেন কিছু একটা হয়েছে! হৃদয় কেঁপে উঠছিল তার। অন্তরের মাঝে এক অজানা ভয় কষ্ট দিচ্ছিল নিরন্তর।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ইয়াতিম বাচ্চাদের জড়িয়ে ধরে তাদের শরীরের ঘ্রাণ নিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন পরম মমতায়। পবিত্র চোখ দুটি বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদছেন!

‘হাবিবুল্লাহ! কীসে আপনি এত ব্যথিত?’

আসমা কাছে এলেন। তার হৃদয়ে আশঙ্কা। মনে মনে যা ভয় করছিলেন তা-ই বুঝি হলো। ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! কী আপনাকে কাঁদাচ্ছে? জাফর বা তার সাথিদের কোনো সংবাদ পেয়েছেন কি?’

‘হ্যাঁ, তারা আজ মারা গিয়েছে।’

প্রিয়তমকে হারিয়ে আসমার হৃদয় ভেঙে চুরমার। বিচ্ছেদের বেদনায় কেঁদে উঠলেন তিনি। দুজনার হৃদয় ছিল এক সুতোয় গাঁথা। আজ সে বাঁধন ছিঁড়ে জাফর পাড়ি জমিয়েছেন অন্য জীবনে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিধবা সাহাবিকে সান্ত্বনা দিলেন। দুআ করে দিলেন।

আমাদের প্রিয় আসমা সবর করলেন। ধৈর্যধারণ করলেন। রবকে আঁকড়ে ধরলেন হৃদয় দিয়ে। কষ্ট ঢেকে নিলেন দুআর চাদরে। সাওয়াব কামনা করলেন তীব্র মনেঃকষ্টের বিনিময়ে। স্বামী যেমন আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হওয়ার গৌরব অর্জন

করেছেন, তেমন শহিদ হওয়ার জন্য দুআ করে চললেন।

একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তার ছেলেকে সালাম দিয়ে বলেন—

হে দুই ডানাওয়ালার ছেলে, আসসালামু আলাইকা।

আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর মর্মার্থ বুঝতে পারলেন। তার স্বামী দুটি কাটা হাত দিয়ে তাওহিদের পতাকা উড্ডীন করে রেখেছিলেন, যাতে তা জমিনে পড়ে গিয়ে পদদলিত না হয়। সেই দুটি হাতের পরিবর্তে আল্লাহ তাকে দুটি ডানা দিয়েছেন। এ ডানা দুটিতে ভর করে তিনি যেখানে ইচ্ছে উড়ে যেতে পারেন। প্রিয়তমা বুঝতে পারলেন তার প্রিয়তম এখন জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছেন।

তাই হতাশ হননি, ভেঙে পড়েননি একেবারেই। তিন ছেলেকে গড়ে তোলার জন্য ধৈর্য ধরে গেলেন। বেশ কিছুদিন না গড়াতেই তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। প্রিয়তমা উম্মু রুমানকে মাত্রই হারিয়েছেন আবু বকর। আসমা তো সিদ্দিকের মতো কাউকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না। বিয়ে করে চলে গেলেন সিদ্দিকে আকবরের ঘরে; ঈমান ও আখলাকের আলোয় আলোকিত হতে আর ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতার প্রলেপ মেখে দিতে। সেই ঘরে একটি ছেলে সন্তান হলো আসমার।

আসমা ছিলেন অনুগত একনিষ্ঠ স্ত্রী। রাসুলের দিয়ে যাওয়া খিলাফত নামক আমানতের দায়িত্ব পালনে আবু বকরকে সাহায্য করতেন তিনি। ধৈর্যের সাথে কাজ করে যেতেন। আল্লাহর কাছে কামনা করতেন পুণ্য। তিনি ছিলেন স্নেহময়ী, প্রিয়তমা, করুণাময়ী ও মহান হৃদয়ের অধিকারী।

কিন্তু এ সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। একসময় স্বামী অসুস্থ হলেন। তীব্র মাত্রায় পৌঁছাল তার অসুস্থতা। কপালে ঘাম জমে গড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রকৃত মুমিনের মতো অনুভব করতে পারলেন মৃত্যুর নৈকট্য। তাড়াতাড়ি অসিয়ত করে গেলেন। স্ত্রী আসমা বিনত উমাইস যাতে তাকে গোসল করান। আরও একটা অসিয়ত ছিল তার। আসমা যেন তার বিদায়ের দিনে সিয়াম না রাখেন। আবু বকর বলেছিলেন, 'এটা তোমার জন্য অধিক শক্তিদায়ক।'

আবু বকরের মৃত্যু সন্নিকটে। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' ও 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে চললেন আসমা। ইতঃপূর্বে আল্লাহ তাকে যেমনিভাবে দৃঢ় রেখেছেন, তেমনই দৃঢ় রইলেন তিনি। স্বামীর থেকে মুখ ফেরালেন না আসমা। স্বামীর চেহারা বিবর্ণ হয়ে আসতে লাগল। একসময় রূহ চলে গেল সৃষ্টিকর্তার কাছে। স্ত্রীর চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। হৃদয় বিগলিত হলো। বিদীর্ণ হলো অন্তর।

তবু আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে কিছুই উচ্চারণ করলেন না। ধৈর্য ধরলেন আরও একবার। বিনিময়ে আল্লাহর কাছে নেকী কামনা করলেন। স্বামীর দেওয়া দায়িত্ব পালন করলেন তারপর। তাকে যে বড় বিশ্বাস করে এ দায়ভার দিয়ে গেছেন আবু বকর! দুঃখ-কষ্ট-বেদনাক্লিষ্ট হয়েও গোসল করালেন স্বামীকে। তবে ভুলে গেলেন দ্বিতীয় অসিয়ত। সাওমরত রয়ে গেলেন আসমা। মুহাজিররা এলে তাদের বললেন, 'আমি সাওম রেখেছিলাম। আজ তো খুবই শীত। আমার কি আজ গোসল করতেই হবে?'

'না।' তারা উত্তর দিল।

দিনের শেষভাগে মনে পড়ে গেল স্বামীর অসিয়ত। এখন কীই-বা করার আছে? দিন তো প্রায় শেষ। কিছুক্ষণ পরই সূর্য ডুববে, সিয়াম পালনকারীরা ইফতার করবে। এখন কি স্বামীর অসিয়ত অনুসারে আমল করবেন? হ্যাঁ, তা-ই করলেন। মারা যাওয়ার পরও স্বামীর আনুগত্য করলেন। পানি নিয়ে এসে তা পান করে সাওম ভেঙে ফেললেন স্বামীর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণে!

বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি পরবর্তীতে ওয়াদা ভঙ্গের সাওম পালন করব না।'

শুরু হলো নতুন সংগ্রাম। ঘরে থেকে গড়ে তুলতে লাগলেন জাফর ও আবু বকরের ছেলেদের। দুই-দুইবার স্বামী হারানোর যন্ত্রণা উপশমে আঁকড়ে ধরলেন সন্তানদের। আসমা দুআ করতেন—যাতে আল্লাহ তাদের নেককার করেন, তাদের দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন আর মুত্তাকিদের সর্দার হিসেবে তাদের কবুল করে নেন।

দিন কেটে গেল। এবার দুই ডানা ওয়ালা জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভাই আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু এলেন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। কিছুটা দ্বিধার পর রাজি হলেন আসমা; যাতে আলি নিজ ভাতিজাদের প্রতিপালনে ভূমিকা রাখতে পারে।

আসমা আলির সাথে চলে গেলেন তার ঘরে। নেককার স্ত্রী হলেন আসমা। আলিও ছিলেন তার উত্তম স্বামী। আলির চোখে আসমার সম্মান দিনে দিনে বেড়ে

চলল। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে বড় হচ্ছে জাফর ও সিদ্দিকের সন্তানেরা! কী সম্মানজনক ব্যাপার!

দিন চলে যায়। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন দেখতে পেলেন জাফরের এক ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু আবু বকরের সাথে তর্ক করছে। একে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে। জাফরের ছেলে বলছে, 'আমি তোমার থেকে বেশি মর্যাদার অধিকারী। আমার বাবা তোমার বাবা থেকে উত্তম।'

আলি বুঝতে পারলেন না কী বলবেন তাদের। কীভাবে দুজনের মাঝে সন্তোষজনক মীমাংসা করে দেবেন। ডাকলেন তাদের মা আসমাকে। তাকে বললেন, 'তাদের মাঝে বিচার করো।'

'আমি আরবের মাঝে জাফর থেকে উত্তম কোনো যুবক দেখিনি, আর আবু বকর থেকে উত্তম কোনো বৃদ্ধ দেখিনি।' প্রজ্ঞা আর উপস্থিত বুদ্ধির ওপর ভর করে আসমা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন। ব্যস! ঝগড়া থেমে গেল মুহূর্তেই। বাচ্চা দুটো আবার গলায় গলা মিলিয়ে খেলাধুলায় মত্ত হয়ে গেল। আর আলি! তিনি তো চমৎকার বিচার দেখে চেয়ে রইলেন বুদ্ধিমতী স্ত্রীর দিকে। বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। আসমার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা আরও বেড়ে গেল তার।

উসমান ইবনু আফফানের পর মুসলিমরা খলিফা হিসেবে বেছে নিল আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। আসমা আবারও কোনো এক আমিরুল মুমিনিনের স্ত্রী হতে পারলেন। চতুর্থ খলিফা আলির স্ত্রী এবার তিনি। অথচ তার জীবনে বারবার নেমে এসেছিল পরীক্ষা। তবু আমাদের প্রিয় এই সাহাবিয়্যা দৃঢ় ছিলেন। ধৈর্যধারণ ও সালাতের মাধ্যমে প্রিয় রবের কাছে সাহায্য চেয়ে গেলেন। স্বামীহারা নারীদের জন্য ধৈর্যের উত্তম প্রতীক তিনি।

আসমা বেঁচে ছিলেন জুঁই ফুলের ডালের মতো। জাফরের মৃত্যুর পর তিনি ছিলেন কচি তরুলতা। খরাপ্রবণ ভূমিতে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছিলেন আপ্রাণ। জুঁই ফুল যেমনি পানির স্বল্পতা মেনে নেয়, ঠিক তেমনি জীবনের কষ্ট-দুর্ভোগ স্বীকার করে নিয়েছিলেন আসমা। যতবার তার অস্তিত্ব বিলীনের উপক্রম, ততবার আল্লাহ তাকে একটি ছায়া দিয়েছিলেন আশ্রয়ের জন্য। তাই জাফরের মৃত্যুর পর তার বিবাহ হয় সিদ্দিকের সাথে। তারপর আলির সাথে। রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। জীবনের কষ্ট ও শত গ্লানি মেনে নিয়ে সবাই দিয়ে গেছেন অফুরন্ত ভালোবাসা, স্নেহ, নিরাপত্তা আর দয়া।

আসমাও জুঁই হয়ে চারদিকে নিজের সুবাস ছড়িয়ে গেছেন; যে সুবাসে আত্মা-মন প্রশান্ত হয়। জান্নাতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আজীবন সবাইকে দিয়ে গেছেন ভালোবাসা। আমাদের মাঝে কেউ কি প্রিয়তমকে হারিয়েছি? হৃদয় কি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে স্বামীর বিরহে? যদি তা-ই হয়, তবে আমরা কেন আসমার মতো হয়ে যাই না? আমরা আসমার মতো হব। মিষ্টি জুঁইয়ের মতো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুভবে অনুভূতি

এই তো প্রথম!

সবকিছুরই একটা শুরু আছে। জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতার একটা 'প্রথমবার' আছে। প্রথম সন্তানের জন্ম, প্রথম পা ফেলা, প্রথম বুলি ফোটা, প্রথম কোনো পুরস্কার জেতা, স্ত্রীর প্রতি প্রথম ভালোবাসা, কিংবা স্বামীকে দেখে প্রথম হৃৎকম্পন। এই তো প্রথম আনন্দ!

আমরা যদি বারবার না ভাবি, চিন্তা-ফিকির না করি, তাহলে আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে, এটাই প্রথম ছিল! মাঝে মাঝে এমন একজনের প্রয়োজন পড়ে, যে আমাদের দেখিয়ে দেবে এই আনন্দ-অনুভূতি আজই প্রথম। আসলেই! এই প্রথমবারের মতো আমরা অনুভব করছি!

আবার দুঃখ-বেদনা-কষ্টও তো প্রথমবারের মতো হয়ে থাকে! কখনো কি প্রিয়তম রাসুলের কথা ভেবে দেখেছি? প্রথম যখন ওহী নেমে এলো, তখন কি তিনি সচকিত হয়ে উঠেছিলেন! কেমন ছিল সে অনুভূতি? যখন প্রথমবারের মতো দেখেছিলেন দিগন্ত-বিস্তৃত জিবরিলের ডানা, তখন কেমন ছিল তার অনুভূতি?

তায়েফের যাত্রা শেষে ফিরে আসছিলেন যখন, যখন নুড়িপাথরের নিক্ষেপে পা দুটো ক্ষতবিক্ষত, গড়িয়ে পড়ছিল রক্ত, যখন কোনোমতে ছুটে গিয়ে প্রবেশ করেছিলেন উতবা-শাইবার বাগানে; তখন কেমন ছিল তার অনুভূতি? সেই কি ছিল প্রথমবারের ব্যথা? কেঁদেছিলেন কি প্রিয় রাসুল? শৈশবে যখন মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেলেন তিনি, কেমন ছিল সেই আঘাত? যেদিন প্রথম জেনেছিলেন তিনি ইয়াতিম, তখন কি কেঁদেছিলেন?

কেমন ছিল আল্লাহর ভয়ে প্রথম ক্রন্দন? প্রথম যে বার তাকিয়েছিলেন আসমানের পানে, কেমন ছিল সেই পবিত্র দৃষ্টি? যুদ্ধে যখন হারালেন পবিত্র দাঁত, সেই অনুভূতি কেমন ছিল? আর তার চোখের অশ্রু? যখন খাদিজার মৃত্যুর সংবাদ শুনেছিলেন প্রথমবার? তখনই-বা কেমন ছিল তার অনুভূতি? হিজরতের সময় সাথে ছিলেন আবু বকর। তাকে নিয়ে হেরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাকে আশ্বাস দিচ্ছিলেন, অভয় দিচ্ছিলেন। কেমন ছিল সেই অনুভূতি?

হায়! কবে তার সাথে প্রথম দেখা হবে হাউজে কাউসারে? তার পবিত্র হাত থেকে কবে সেই পানি পান করার সৌভাগ্য হবে? কবে আল্লাহর সাহচর্য পাব প্রথমবারের মতো? আদৌ তাঁর নৈকট্য পাব কি? কপোল গড়িয়ে পড়া যে অশ্রুতে ভিজিয়ে দিলাম জমিন, সেই অশ্রু কি সত্যিই রবের ভয়ে? তাঁর ভয়ে কাঁদতে পারব কবে? কবে বুঝতে পারব এ অশ্রু কেবল তাঁরই জন্য?

সালাতের তিলাওয়াতে প্রথম খুশু—কবে অনুভব করব? কবে আমরা টের পাব, সালাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি? তখন কি আমাদের আত্মাগুলো বুকের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বেরিয়ে আসবে? সাঁতরে বেড়াবে রবের সৃষ্টির মাঝে? তারপর আবার ফিরে আসবে সালাম ফেরানোর পর—হৃদয়-মন প্রশান্ত করতে!

কবে গুনাহ ছেড়ে দেবো প্রথমবারের মতো? খাঁটি তাওবা হবে কোনদিন? কবে ফিরে যাব আল্লাহর কাছে? কবে প্রথমবারের মতো দ্বীনের পথে চলব? প্রথম অনুভব করব ঈমানের স্বাদ, বিনয়ের প্রশান্তি? কবে কেবল তাঁরই জন্য সিজদায় অবনত হয়ে অনুভব করব তাঁরই সাহচর্য?

প্রথমবারের মতো একবার পুলসিরাতে দাঁড়াতেই হবে। আমরা কি প্রস্তুত সেই প্রথম পা ফেলতে? প্রথমবারের মতো কবরে যেতেই হবে, একাকী। প্রথমবার দেখা হবে রবের সাথে! যখন একজন আহ্বানকারী ডাকবে, 'হে জান্নাতবাসী! তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে!' রহমানের সাথে সেই মুহূর্তটা কেমন হবে! আর আমিই-বা এমন কে, যে আল্লাহ সুবহানাহুর সাথে সাক্ষাতে ধন্য হব?

তখন আমি এগিয়ে চলব সানন্দে, হৃষ্টচিত্তে, মাথা উঁচু করে। যে চোখ দিয়ে কোনো হারাম দেখিনি, সেই চোখ তুলে তাকাব। আল্লাহ পর্দা সরিয়ে দেবেন। তাকিয়ে থাকব অপলক। প্রাণভরে দেখব তাঁকে। ভেতরটা কেঁপে উঠবে, বিনয়ে হব নতজানু। অনুভূত হবে এক অনাবিল, অপার্থিব প্রশান্তি; প্রথমবারের মতো। চোখ

বন্ধ করতে পারব না, পারব না মাথা নাড়াতে। এমনকি নিঃশ্বাসও হয়তো থেমে যাবে! দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়বে আনন্দের অশ্রুধারা!

কী চমৎকার অনুভূতি হবে, প্রথমবারের মতো আল্লাহকে দেখা!

প্রিয়জন আলিঙ্গানে

মানুষমাত্রই আলিঙ্গান খোঁজে। কখনো মায়ের আলিঙ্গান, কখনো বাবার। কখনো-বা অতি আপন কারও উষ্ণ আলিঙ্গানের প্রতীক্ষায় দিন কাটে। কেউ আশায় থাকে প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলিঙ্গানের।

হেরা এক নিশ্ছিদ্র নীরবতা আর রহমতের গুহা। জনমানুষ থেকে বহুদূরে। পাহাড়টা যেন ভয়মিশ্রিত অনুগ্রহে আলিঙ্গান করেছে এই গুহাটিকে। গুহাটা নিজ কোলে জায়গা দিয়েছে হাবিবুনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। তিনি সেখানে বসে ভাবেন, ইবাদত করেন, স্রষ্টার সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন।

জিবরিল আলাইহিস সালাম নবিজির কাছে এসেছেন ওহি নিয়ে। ধ্বনিত হয়েছে 'ইকরা' বাণী। আল্লাহ তাকে সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াতের আদেশ দিয়েছেন। এক প্রিয়জন পড়ে শোনাতে এসেছেন আরেক প্রিয়জনকে। জিবরিল জড়িয়ে ধরলেন নবিজিকে। নবিজি তখন কেঁপে অস্থির। কাঁপছেন আর কাঁপছেন। এক সংকটময় পরিস্থিতি! ভয়াবহ অনুভূতি! অবশেষে তাকে ছেড়ে দিলেন জিবরিল। আর বললেন—

পড়ো, তোমার সৃষ্টিকর্তার নামে; যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[১]

[১] সূরা আলাক, আয়াত: ১

এক মহান ফেরেশতার আলিঙ্গানের পরপরই সৃষ্টির সেরা মানুষের কাছে অবতীর্ণ হলো কুরআনের প্রথম আয়াত। জিবরিল তাকে ভালোবেসেছেন; কারণ, আল্লাহ যে তাকে ভালোবাসেন!

মহান আলিঙ্গান!

একসময় ওই পরিস্থিতির অবসান ঘটে। জিবরিল অদৃশ্য হয়ে যান। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছুটে যান নিজ ঘরে। কম্পিত, ভীত-সন্ত্রস্ত ও গলদঘর্ম। ফিরে চলেন স্ত্রীর আলিঙ্গানে।

'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।'

আমাদের মা খাদিজা তার গায়ে জড়িয়ে দেন পশমের চাদর। কপাল থেকে মুছে দেন ঘাম। তাকে জড়িয়ে ধরেন, যাতে তিনি ভরসা পান। আবারও এক সম্মানিতা স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীকে আলিঙ্গান। এ আলিঙ্গান নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশান্তি দেবার জন্য, তার মনে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য।

সম্মানের আলিঙ্গান!

যাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মুতার যুদ্ধে প্রাণপণে লড়ে শহিদ হলেন। জাফর ইবনু আবি তালিবও তার পরে ছুটে গেলেন। তুলে নিলেন পতাকা। সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন পুরোদমে। ডান হাত কাটা পড়ল। রক্ত গড়িয়ে পড়ল অবিরত। দৃঢ়তার সাথে পতাকা তুলে বাম হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। এবার বাম হাতও কাটা পড়ল। তাও হাল ছাড়েননি। দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন পতাকা। তাওহিদের পতাকা তখন শহিদের রক্তে সিক্ত। সে পতাকা জড়িয়ে ধরেছেন তিনি। এ আলিঙ্গান তো সেই হৃদয়ের আলিঙ্গান—যা ভালোবেসেছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, যাকে ভালোবেসেছেন স্বয়ং প্রিয় নবি!

শাহাদাতের আলিঙ্গান!

তার শাহাদাতের খবর পৌঁছে গেল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। তিনি ছুটে গেলেন জাফরের সন্তানদের ঘরে। জড়িয়ে ধরলেন তাদের। আলিঙ্গানে আবদ্ধ করলেন সবগুলো শিশুকে। তাদের চুম্বন করে কাঁদতে লাগলেন।

অনুগ্রহের আলিঙ্গন!

আবু দুজানা। সাহসী অশ্বারোহী। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। বীর যুবক। এক মহান সাহাবি। উহুদের যুদ্ধ চলমান। আবু দুজানার মাথায় একটা লাল পাগড়ি বাঁধা। হেলে-দুলে সদর্পে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। সাহসিকতার সাথে লড়াই করছেন। তরবারি উঁচু করে। বিস্ময়কর তার পারদর্শিতা। তাকে দেখলে যে-কেউ ভালোবেসে ফেলতে বাধ্য হতো।

উহুদের প্রান্তরে চলছে তীব্র যুদ্ধ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হলেন। রক্ত গড়িয়ে পড়ল তার মুখ বেয়ে। তাকে রক্ষা করতে হাজির পাঁচজন আনসার সাহাবি। সবাই শহিদ হয়ে গেলেন। শত্রু-শিবির ভেদ করে ঢুকে গেলেন আবু দুজানা। জড়িয়ে ধরলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। নিজের পিঠকে বানালেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঢাল। নিজের শরীর, পিঠ ও কাঁধ দিয়ে হিফাযত করছিলেন নবিজিকে। আঘাতের পর আঘাত সয়ে যাচ্ছিলেন। মনের ব্যথা চেপে রাখছিলেন! পিঠ বেয়ে অনবরত গড়িয়ে পড়ছে রক্তের স্রোত। পিঠ হয়ে গেছে সজারুর মতো, সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। তিরের পর তির বিদ্ধ হচ্ছে। তবু ঝুঁকে পড়ে পবিত্র দেহটাকে রক্ষা করে চলেছেন নিজের দেহ বিলিয়ে। তার আত্মা তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উৎসর্গীকৃত!

ত্যাগের আলিঙ্গন!

'আপনার গলার আগে আমার গলা, হে আল্লাহর রাসুল!'

বললেন আবু তালহা। মাথা উঁচু করে। ঘাড়টাকে যতদূর পারা যায় বিস্তৃত করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করার জন্য। দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের কাঁধ। তারা তখন আল্লাহর নবির দিকে গোল হয়ে তাকে কেন্দ্র করে মানব-প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। মুশরিকরা ঘিরে আছে চারদিক। তারা চেয়েছিল নবিজিকে কষ্ট দিতে।

ভালোবাসার আলিঙ্গন!

এই সব আলিঙ্গান যেন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সর্বোচ্চ নমুনা। তাদের প্রতিটি হৃৎস্পন্দন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসার জানান দিচ্ছিল। নবিজির পাশে থাকতে পারার আনন্দে উন্ন ছিল তাদের মন। আমরা যেন তাদের চোখের সামনে দেখতে পাই। আমাদের প্রতিটি শব্দ, অর্থ ও কথাবার্তায়

যেন অনুভব করি তাদের। টের পাই তাদের নিঃশ্বাসের উষ্ণতা। যেন আমরাই তারা, আর তারাই আমরা। তারা ভালোবেসেছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। সে জন্যই তাদের ভালোবাসি আমরা! হায় যদি তাদের জায়গায় আমরা হতাম অথবা তারা থাকত আমাদের সাথে! আল্লাহর রাসুল, আপনার সাথে সাক্ষাতের তীব্র বাসনা বুকে লালন করি। আপনার নুর, রহমত, সাক্ষাৎ, সঙ্গ ও ব্যক্তিত্বের আকাঙ্ক্ষী আমরা! আপনার চেহারা দেখতে অধীর আগ্রহী!

আল্লাহ! আমরা চাই—আপনি তাদের সাথে আমাদের হাশর করুন। নবিজির পাশেই করুন, তার পেছনে, তারই পতাকাতলে থাকার তাওফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমরা তাদের ভালোবাসি। আরও ভালোবাসি প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে।

ভালোবাসার ছাপ

ভালোবাসার ছাপ

জীবনে চলার পথে প্রয়োজন একটু প্রশান্তির, একটু পর্যবেক্ষণের; পবিত্র হৃদয়ের ভালোবাসা অনুভবের। যাতে আমাদের হৃদয় ভরে যায় প্রশান্তিতে। মনের কোণে ভালোবাসার ছাপ তৈরি হয়। আমাদের মন যে রহমতের কেন্দ্রস্থল!

ভালোবাসার ছাপ

তাকে সুযোগ দিই। ধৈর্য ধরি কথা শেষ করা পর্যন্ত। নামিয়ে রাখি চোখ দুটো। অথবা তার দিকে তাকাই ভালোবাসার চোখে। তিনি তো আমারই বাবা। তার চেহারায় কাঠিন্যের ছাপ? যা সাময়িক! খানিক বাদেই মুচকি হাসিতে উদ্ভাসিত হবে তার মুখমণ্ডল।

ভালোবাসার ছাপ

তার অনুপস্থিতিতে কি খোঁজ-খবর নিই? হয়তো তার খামতি আছে, আমার সামাজিক অভাব পূরণ করতে পারেননি, তবু তার খোঁজ-খবর রাখা চাই। হয়তো তিনি তেমন নন, যেমনটা আমি চাই। হয়তো তিনি আমার বন্ধুদের মাঝে এক বিশাল বাধা। হয়তো কেউ খেয়ালও করবে না, তিনি আমার সাথেই চলাফেরা করছেন। তবু যেন মনে রাখি, তিনি অন্যরকম মানুষ নন; তবে তার চোখে আমি অন্যরকম।

ভালোবাসার ছাপ

যখন তাকাব, অনুগ্রহভরে তাকাব। কথা বলব কেবল সাওয়াব অর্জনের জন্য। ভাষা হবে উত্তম, বিবাদে লিপ্ত হলেও। ইয়াতিমের কাঁধে-মাথায় বুলিয়ে দেবো মমতার পরশ।

ভালোবাসার ছাপ

প্রস্তুত হই তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ভীত হয় আল্লাহর ভয়ে। সারা দুনিয়া রেখে দিই পেছনে। মনে মনে স্মরণ করি তাঁকে। গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যাই। বিগলিত হই তাঁর সামনে। ঘোষণা দিই 'আল্লাহু আকবার'। মনের গহীনে গড়ি ভালোবাসার ছাপ।

ভালোবাসার ছাপ

মনোযোগী শ্রোতা হব। শান্ত হব, যাতে বুঝতে পারি। পড়ব, যাতে জানতে পারি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাহ পড়ব। তার নামে সালাত পাঠ করব প্রতি রাতে। তিনি যে আমাকে ভালোবাসেন। হয়ে যাব সাহাবিদের মতো, যাতে আমাদের সাথে তার দেখা হয় হাউজে কাউসারে, যাতে আমরা ধন্য হই তার সান্নিধ্যে।

ভালোবাসার ছাপ

ঠোঁট দুটো চেপে ধরি, যাতে এলোমেলো শব্দগুচ্ছ বেরিয়ে না পড়ে। এ শব্দেরা পবিত্র হৃদয়কে কলুষিত করে দেয়, মনকে কষ্ট দেয়, আঘাতে আঘাতে নিঃস্ব করে দেয়। নিঃশ্বাস নিই ভালোবাসার, কথা সাজাই উত্তম শব্দে।

ভালোবাসার ছাপ

তারা যেন আশাহত না হয় আমার ব্যাপারে। নিশ্চিতভাবে জেনে নিই তারা কী চাইছে আমার কাছে! দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, তারা জানে যে আমি-ই পারব। যখনই তারা চাইবে, তখনই সেখানে থাকতে পারি যেন! জেনে নিই কীসে দেবো অগ্রাধিকার? কারণ, আমি তো তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের প্রত্যেকের চোখে আমিই সমগ্র পরিবার।

ভালোবাসার ছাপ

অর্ধাঙ্গীকে কষ্ট দিই না যেন। যাকে নিয়ে পূর্ণ হব, তাকে আঘাত দিই কী করে! আমরা দুজন তো এখন একজনই, দুই দেহে একই প্রাণ। আপন সত্তাকে কি আক্রমণ করা যায়? নিজেকে কি হত্যা করা যায়? আমিই তো সে! সে ই তো আমি!

ভালোবাসার ছাপ

তারা যেমনই হোক, ভালোবাসা হোক অফুরান। তাদের অপারগতায় জেরা করা অন্যায়। কেননা তারা বাঁচে ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন নিয়মে। সেসব থেকে তাদের আলাদা করে ফেলতে পারি না আমরা। হয়তো অমন অক্ষমতা আমারও আছে ভিন্নরূপে, তবে অন্যেরটা মেনে নিচ্ছি না কেন? আমি কি পারব নিজের দেহের আকৃতি বদলে নিতে? তবে লোকের পরিবর্তন চাইছি কেন!

ভালোবাসার ছাপ

এ সুন্দর বিশ্বজগৎ দেখি। দুনিয়ার দিকে তাকাই মুসাফিরের চোখে, যে মুসাফির প্রস্তুতি নিচ্ছে অনন্ত যাত্রার। ভ্রমণের পাথেয় গুছিয়ে নিতে ভুলি না যেন। যখন ব্যস্ত হয়ে যাব ওপারে সুন্দর বাড়ি বানাতে, তখন দয়ার্দ্র হব, ভালোবেসে যাব, আগুয়ান হব আখিরাতের পথে। আখিরাতই যে ধ্রুব সত্য!

ফেরেশতাদের আলাপনে

তারা কথা বলছে। ফিসফিস করছে। সংবাদ বহন করছে। আনন্দচিত্তে এগিয়ে চলছে সুসংবাদ নিয়ে। একে অপরকে আহ্বান করছে তোমায় ভালোবাসতে। হ্যাঁ, এই যে তুমি পড়ছ আমার লেখা, তোমাকেই বলছি—তুমিই ফেরেশতাদের আলোচ্য বিষয়।

তারা তোমার কণ্ঠস্বর চেনে। অন্ধকার রাতে এক দীর্ঘ সিজদায় কী চেয়েছিলে—সবই তারা শুনেছে। তোমার দু-চোখের অশ্রুধারা সাক্ষ্য দিচ্ছে তোমার পক্ষে। তারা চেনে তোমার সুন্দর চেহারা, যে চেহারা শেষরাতে ইস্তিগফার করে চলে। ফলে সৃষ্টি হয় এক মিষ্টি অবয়ব। তুমি যে আল্লাহকে সিজদায় ডাকো, সেই ফিসফিসানি, তাওবা করার সময় তোমার চোখ বেয়ে যে অশ্রু ঝরে, যা তোমার মুখমণ্ডল আলোকিত করে দেয় , গুনাহ মুছে দেয়—তা-ও তারা চেনে।

যতবার তুমি আল্লাহর কাছে ফিরে চলো, ততবার তোমার মুখে যে পবিত্র ছাপ ফুটে ওঠে—তা তারা জানে। গুনাহর পর তাওবা করার সময় যে আর্তনাদ তুমি করেছ, তাও তারা চেনে।

তোমার যে দয়ার্দ্র হাত ভালোবাসায় মায়ের কাঁধে, বাবার পিঠে পরশ বুলিয়ে দেয়, সসম্মানে দরিদ্রের হাতে কিছু গুঁজে দেয়, অনুগ্রহ ভরে ইয়াতিমের মাথা স্পর্শ করে, বিনয়ের সাথে কিতাবুল্লাহকে আঁকড়ে ধরে যাতে তুমি পৌঁছে যাও জান্নাতের উচ্চ স্তরে—সে হাতও তারা চেনে বৈকি!

তারা চেনে তোমার নজর। অজুর পানিতে নিয়ত সিক্ত চোখে যে নজর আছে, তা হারাম থেকে কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে তোমায়—তা তাদের জানা। যখন মন্দ দেখে চোখ নামিয়ে নিলে, তখনও তারা দেখেছে তোমায়।

তারা জানে তোমার হৃৎকম্পনের আওয়াজ। এ আওয়াজ বাড়তে থাকে, বাড়তেই থাকে। হৃৎকম্পন যেন জানিয়ে দেয় ইবলিসের আক্রমণের কথা, যে আক্রমণের মাধ্যমে ইবলিস তোমাকে পাপাচারে লিপ্ত করতে চায়। আর তুমি সর্বদা আল্লাহর কাছে ধরনা দাও, তারই অনুগ্রহ কামনা করো। তুমি অজু করলে তোমার অন্তর সিজদা করে। কমে আসে তোমার হৃৎকম্পন। তাই তো সালাতে তুমি ধীর-স্থির হতে পারো!

তোমার নাম-উপাধি নিয়ে তাদের মাঝে আলোচনা চলে। কারণ, তুমি যে তোমার রবকে ভালোবাসো! আর তিনিও যে তোমায় ভালোবাসেন!

» কারণ, তুমি যে সর্বদা প্রশংসা করো।

» কারণ, কুরআন শুনলে যে তোমার হৃদয়টা কেঁপে ওঠে।

» কারণ, তুমি যে আখিরাতকে ভয় পাও, তোমার রবের অনুগ্রহ চাও।

» কারণ, যিকিরের সময় তোমার হৃদয় বিগলিত হয়।

» কারণ, তুমি যে আল্লাহর চেহারা দেখার গভীর বাসনা ব্যক্ত করো।

» কারণ, তুমি যে সত্যবাদী বিশ্বস্তদের কাতারে হাশর চাও।

» কারণ, আল্লাহর দেওয়া নূরে আলোকিত হয় তোমার মুখ।

» কারণ, তুমি ভালোবাসো নেককারদের, বন্ধুত্ব পাতাও মুত্তাকিদের সাথে।

একটু অনুভবের চেষ্টা করো তো, ভাবো একবার—তুমি যেন ফেরেশতাদের কলমের খসখসানি শুনতে পাচ্ছ। তোমার ভাবনা, তোমার কর্ম, তোমার অনুভূতি—সবই তারা লিখে রাখছে।

কল্পনায় পরিভ্রমণ করো সেদিকে। আরশের নিচে তুমি অপেক্ষা করতে থাকো। ভাবতে থাকো। মনোযোগ দিয়ে শোনো আর এদিক-সেদিক তাকাও। দেখতে পাবে এদিকে নুর, সেদিকে নুর, নুরের ছড়াছড়ি সর্বত্র। ফেরেশতারা সালাম দিয়ে ডাকছে তোমায়। তুমি অবাক হবে! তুমি তো তাদের চেনো না, কিন্তু তারা যে তোমায় চেনে। তুমি যে এ দুনিয়ায় ফেরেশতাদের বাতচিতের বিষয়বস্তু!

কল্পনা করো—তুমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছ। এমন সময় তারা ঘিরে ধরেছে তোমায়। জানাচ্ছে সুসংবাদ। প্রশান্ত করে দিচ্ছে তোমার মন। কারণ, তারা যে তোমায় চেনে! কল্পনা করো যে—তারা তোমার পবিত্র আত্মা নিয়ে উড়ে চলেছে সুউচ্চ আকাশে। কল্পনা করো যে তুমি বিনীত হয়ে মাথা তুলছ। যে চোখ দিয়ে কখনো তুমি হারাম দেখোনি, সে চোখ ভরে আল্লাহকে দেখার জন্য চোখ তুলে তাকাচ্ছ! ইয়া আল্লাহ!

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ানো উচিত। আমাদের উচিত নিজেকে প্রশ্ন করা—আমরা কি আদৌ এতটা ভালোবাসা পাবার যোগ্য? আল্লাহ কি আমাদের ভালোবেসে ফেরেশতাকে ডেকে বলেন, 'জিবরিল! অমুককে ভালোবাসো। কেননা আমি তাকে ভালোবাসি।' সুবহানাল্লাহ!

মেঘমালা বিদীর্ণ করে কি কোনো ফেরেশতার আওয়াজ শোনা যায়? যে আওয়াজে আসমানগুলো কেঁপে ওঠে, মেঘখণ্ড নড়ে ওঠে, নক্ষত্ররাজি জ্বলজ্বল করে। সে আওয়াজ কি উচ্চ আসমানে বলে ওঠে, 'তোমরা অমুককে ভালোবাসো; কেননা আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন।' ফলে ফেরেশতারা তোমাকে ভালোবেসে ফেলে।

আমাদের হৃদয়গুলো তীব্র কামনা ও আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষমাণ। চলো, আমরা ছুটে চলি। চলো, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য এগিয়ে চলি। হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরে আপনার ভালোবাসা প্রসারিত করে দিন। আপনি দৃষ্টিপাত করুন আমাদের প্রতি। আপনাকে দেখার সুযোগ করে দিন। আপনার সাথে সাক্ষাতের কামনা-বাসনা জাগিয়ে দিন। ইয়া ইলাহি! আমাদের বানিয়ে দিন ফেরেশতাদের আলাপের বিষয়!

জান্নাতের ট্রেন

চায়ের ঘ্রাণ ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে। এদিকে ওদিকে বিক্রেতাদের বিচরণ। পথ লোকে লোকারণ্য। ছাতা নিয়ে কারও আগমন। বাচ্চাদের ছুটোছুটি। সুন্দরী এক যুবতী সলাজ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। নরম হাতের তালুতে ঢেকে রেখেছে চোখের পানি। সামনে যুবকটা দাঁড়িয়ে। তার অশ্রু মুছে দেওয়ার সাহস করছে না। ট্রেন যেন না আসে—এমনটাই তার কামনা। বিদায়ের ক্ষণটা দীর্ঘ করবার আশা তার মনে। এক ভাই কাঁদছে অপর ভাইয়ের সাথে বিচ্ছেদের মুহূর্তে। স্ত্রী কাঁদছে প্রিয়তম স্বামীর বিদায়ে।

অনেক অনেক অনুভূতি। অসংখ্য বেদনার ঢল। বিদায়বেলায় যেন কলিজাটা ছিঁড়ে নিচ্ছে তারা। কেউ কাঁদে। কেউ-বা মুচকি হাসে, তবে চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু। হাত নেড়ে বিদায় জানায় প্রিয়জনকে। অপরজন চিৎকার করে ছেলেকে বিদায় জানিয়ে বলে—'নিরাপদে থেকো! ভালোবাসি বাবা! আবার দেখা হবে। পড়াশোনা কোরো ভালো করে।' ট্রেন ছেড়ে দেয়। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি পড়তে থাকে। মিশে যায় অশ্রুবিন্দুর সাথে। এই তো দুনিয়া!

আমরা সবাই যাত্রী। প্রস্তুতি নিচ্ছি অনন্ত যাত্রার। আমাদের পাথেয় কম, পথ দীর্ঘ। আর আমাদের ট্রেন? সে তো অন্য কোনো ট্রেনের মতো নয়! কেউ নিজের অজান্তেই চড়ে বসে সেই ট্রেনে। কেউ হয়তো জানেই না যে, সে টিকিট কেটে ফেলেছে। কেউ বা আবার মূল্য পরিশোধ করছে।

কামাল। দয়ালু মানুষ। পবিত্র চেহারা। সত্যদর্শী দু-চোখের ওপরে ভ্রু দুটো যেন নতুন চাঁদের মতো। মাথায় পরিপাটি করে বিছানো কেশ, স্থানে স্থানে পাক ধরেছে। প্রতিটা কেশ যেন সাক্ষ্য দিচ্ছে তার হয়ে। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে এক উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তির। যিনি প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে ধৈর্য ধরে গেছেন। একনিষ্ঠতার সাথে বড় করেছেন তিন-তিনটা মেয়েকে। আল্লাহর কাছে নেকি কামনা করে। সাওয়াবের আশায়। মেয়ে তিনটা যেন তিনটা তারকা। স্বামীদের আকাশে জ্বলজ্বলে তারকা। যে তারকা ছড়ায় উত্তম চরিত্রের সুবাতাস, কুরআনের আলো। প্রজাপতির মতো এখানে-সেখানে ছড়িয়ে দেয় পবিত্রতার আবেশ। কামাল জানতেন না তার টিকিট কাটা হয়ে গেছে। তার দাম দিচ্ছেন তিনি। তাই চলে এলো বিদায়ের ক্ষণ। দ্রুততর হলো শ্বাস-প্রশ্বাস। ধীরে ধীরে থেমে গেল হৃৎস্পন্দন। শিয়রে তখন তিনটি ফুল, 'বিদায় বাবা, দেখা হবে জান্নাতে!'

হাবিবা। বুদ্ধিমতী এক তরুণী। সবার প্রিয়। এর খবর নেয়। ওকে খাওয়ায়। রাতে প্রতিবেশিনীর বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেয়, সাহায্য করে বাড়িভাড়া দিতে। প্রতিবেশী ডাক্তারের বাড়িতে অসুস্থ কোনো বাচ্চাকে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে ফিরিয়ে দেন না। কারণ, ডাক্তার তার মহানুভবতার কথা জানেন। বান্ধবীদের থেকে টাকা তুলে কারও জন্য ঔষধ কিনে দেয় হাবিবা। আলমারি খুলে নিজের সবচেয়ে ভালো জামাগুলো বের করে অন্যকে দান করে। সফেদ শুভ্র জামাটা দেখেও থমকে যায় না। জামার ওপরে খচিত মুক্তোদানার ঝলকানি তার মন কেড়ে নেয় না। বরং সে থমকে যায় বিধবা নারীকে দেখে। তার মন কেড়ে নেয় ইয়াতিম শিশুর চোখের ঝলকানি। তার হৃদয়ে নাড়া দেয় অসুস্থ ব্যক্তির করুণ চাহনি। অসুস্থ নারীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সে। এই তো ট্রেন এসে গেছে। তাকেও উঠে বসতে হবে। তার ডানে একটা মেয়ে তার সেবা করে চলছে। তার বোন না, মেয়েও না। কিন্তু সেই মেয়েটা তাকে চেনে। কারণ, সে যে ভালোবেসে তার যত্ন নিয়েছিল একবার। 'বিদায় হাবিবা, দেখা হবে জান্নাতে!'

আহমাদ। চমৎকার এক যুবক। তার দিকে তাকালে মনে হবে তারুণ্যে সবচেয়ে সুন্দর রূপটা বোধহয় সে ই পেয়েছে। কালো দু-চোখ আবৃত করে থাকে মমতায় ভরা চোখের পাতা। চোখের পাতা খোলে আর বন্ধ হয়। যেন তা একটি কবুতরের মতো ডানা ঝাপটায়। দীর্ঘ শরীর। সুঠাম শক্তিশালী দেহ। কিছুটা ব্যথিত অভিব্যক্তি। দুর্বলতার ছাপ প্রকাশিত। তার ওপর নানা বিপদ নেমে এলেও সে বেশ সন্তুষ্ট। এর বিনিময়ে নেকির আশা করে সে। তীব্র কষ্টেও তার কান্না আসে না। বরং কেঁদে চলে তার নেক আমলের স্বল্পতায়। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে। যৌবনের পাপ স্মরণ করে প্রচণ্ড আফসোসে।

এখন দ্বীনের পথে দৃঢ়পদ। তার বন্ধু কুরআন। এই তো ট্রেন এসে পড়েছে। কুয়াশার পর্দা ছিন্ন করে। ফেরেশতাদের কণ্ঠ ডাকছে তাকে। মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ঔষধ পান করাচ্ছেন। 'শাহাদাতাইন'-এর সুমিষ্ট স্বাদ নিচ্ছে তার জিহ্বা। মায়ের ফিসফিস কথা, 'বিদায় চোখের মণি আমার, দেখা হবে জান্নাতে!'

হুসাম। বুদ্ধিমান যুবক। দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তার। সফল ও অধ্যবসায়ী। চরিত্রবান ও ভদ্র। এমনটাই তার ব্যাপারে সবাই বলে। জান্নাতের প্রতি তার তীব্র বাসনা। তাই তো স্ত্রী-মাকে বিদায় জানিয়ে ছুটে গেছে সেদিকে, যেদিকে রক্তের ঘ্রাণও সুরভি ছড়ায়। যেখানে তারাই নাজাত পায়, যারা মাটির নিচে চলে যেতে পারে। যে স্থানে অন্যায়-অবিচার মাত্রা ছাড়িয়েছে। বাহন নামাল সেখানে। টিকিট কেটে নিল। উঠে বসল ট্রেনে। শাহাদাতের মর্যাদা অর্জন করে নিল। তাকে বিদায় জানাল পৃথিবী। আসমান তার তরে সেজেছে সুন্দর করে। তার আগমনে অভ্যর্থনা জানাল আসমানি পাখিরা। ভালোবাসা, তীব্র কামনা ও উদগ্র বাসনা নিয়ে তাকে ঘিরে ফেলল জান্নাতের হূর। 'শহিদ, তোমাকে সালাম জানাই। দেখা হবে জান্নাতে!'

চোখ মুছে ফেলি। কেন কাঁদব তাদের জন্য? তারা তো এগিয়ে চলেছে। সফল তো তারাই। ভালো মতো চোখটা কচলে সরিয়ে ফেলি চোখের পর্দা; যাতে স্পষ্ট দেখতে পারি। ভাবি, কোথায় আছি আমি? আমার টিকিটটা কোথায়? অপেক্ষা করি ট্রেনের জন্য। এই ট্রেনের তো কোনো নির্ধারিত সময় নেই। নেই কোনো বড় স্টেশন, যেখানে চায়ের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে! যত পারি সৎকর্ম করে নিই। আর যদি টিকিটের পর ট্রেন চলে আসে, তবে তাতে উঠে পড়ি এই বেলা। দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

আচ্ছা, একসাথে সবাই অপেক্ষা করি না কেন? সফরের জন্য প্রস্তুত করি সব পাথেয়। সেই যাত্রা বড় কঠিন! তবু তো যেতেই হবে! এ যাত্রা যে জান্নাতের পথে!

পর্দা করে তবে...

বিয়ের দিন হিজাব খুলে ফেলল সে। মাথাটা তার কোনোমতে এক টুকরো কাপড় দিয়ে ঢাকা। আমি আর আমার স্বামী বরকতের জন্য দুআ করে দিতে গেলাম। দেখতে গেলাম কথা বলার উদ্দেশ্যে। পাশে বসার পর সে বিয়ের ছবিগুলো নিয়ে এলো। আমাদের দেখানোর জন্য। অবশ্য তাকে বলেছিলাম অ্যালবামটা না খুলতে। জানালাম যে তার পরনে হিজাব নেই। এই নন-হিজাবী বিয়ের ছবি আমার স্বামী দেখবে না।

পর্দা সে করে বটে, তবে ভুলেই গিয়েছিল যে, সে পর্দা করে!

পর্দা করে তবে...

মেয়েটার বোন আসছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে ছুটে গেল সে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হলো। কারণ, লাগেজ নামাতে সময় লাগে। অবশেষে চোখে পড়ল বোনের মুখ। সাথে তার স্বামীও। যিনি একজন শিক্ষক।

ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে বোনকে জড়িয়ে ধরল সে। এমনকি তার স্বামীকেও! ভুলে গেল যে, বোনের স্বামী তার জন্য গায়রে-মাহরাম!

পর্দা করে তবে...

বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। উপস্থিত আছে সে ও। সবাই বেশ ফিটফাট। আনন্দঘন পরিবেশ। হাই ভলিউমে গান বাজছে। হাততালি দিয়ে গলা মিলিয়ে চলছে কজন।

তার ভেতরটাও নেচে উঠছে।

মা তার হাত ধরে টেনে আনল। বলল, 'আনন্দ করো, এটাই তো বয়স!'

সে মিশে গেল সবার মাঝে। নেচে-গেয়ে হেসে খেলে একাকার। কেউ কেউ অবশ্য ইশারা ইঙ্গিতে বিদ্রুপের হাসি হেসেছিল। তাকে নিয়ে নয়, তারা হেসেছে তার পর্দা নিয়ে!

পর্দা করে তবে...

কালো লম্বা ফ্রকটা পরে বেরিয়ে এলো সে। বড় একটা চাদরে শরীরের সামনের অংশ ঢাকা। গাড়িতে ওঠার সময় এক পা তুলল। সরে গেল ফ্রকের নিচটা। সবার দৃষ্টি ফর্সা পা দুটোতে।

পর্দা করে তবে...

কালো বোরকা কিনেছে সে। হাতার অগ্রভাগ এতই প্রশস্ত যে অর্ধেক হাত দেখতে পাওয়া কঠিন কিছু নয়। আর হাতটা উঁচু করলে তো পুরোটাই চোখে পড়ে যায়!

এমন না, সে জানে না। আলবৎ জানে। এই তো কদিন আগেও কোনো এক অনুষ্ঠানে এমন হাতাওয়ালা গাউন পরেই গিয়েছিল সে। তবে পাতলা হাতার ভেতরে কনুই পর্যন্ত আলাদা কোনো কাপড় ছিল না।

পর্দা সে করে বটে, তবে সবই খোলামেলা।

পর্দা করে তবে...

বোরকার গলাটা বেশ বড়। আবরণও এত স্বচ্ছ যে, ভেতরটা দেখা যায়। সুযোগ!

হ্যাঁ, চমৎকার গলার যে হারটা পরে আছে, সেটা দেখানোর একটা সুযোগ। স্বচ্ছ হিজাবের নিচে সেটা বেশ সুন্দর দেখায়।

অবশ্য তুমি তাকে সতর্ক করতে গেলে সে বাঁকা চোখে তাকাবে। এমনভাবে উত্তর দেবে যেন সে অপরাধী নয়, তুমিই অপরাধী!

পর্দা করে তবে...

টাইট জিন্স পরে। ওপরে একটা শার্ট। মাথায় হিজাব। কেউ যদি কিছু বলে তবে রেগে-মেগে উত্তর দেয়, 'আমার এই জিন্স তোমাদের বোরকার থেকে বেশি ঢেকে রাখে।'

আচমকা কোথাও বসলে জিন্স চিপসে যায়, তার পায়ের আকৃতি ধরা পড়ে স্পষ্টভাবে। সে এখন পুরুষদের মতো বসে। পা বিছিয়ে দিয়ে। অথবা পায়ের ওপর পা তুলে। বিপদের সময় হলো—যখন সে কোনো বাচ্চাকে কোলে নিতে অথবা জুতা পরতে নিচু হয়। সমস্যা হলো—এ রকম মহিলাদের কেউ আছে খুবই স্থূল। তবু তারা জিন্স ছাড়তে পারে না।

পর্দা করে তবে...

বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আয়নায় তাকাল সে। নিজেকে ডানে-বামে ঘুরে ঘুরে দেখে। হঠাৎ খেয়াল চাপল, সামনের কয়েকটা চুল বের করে দেওয়ার। হয়তো এতে আরও বেশি সুন্দরী লাগবে তাকে। তাই হিজাবের আড়াল থেকে যত্ন করে কিছু চুল বেরিয়ে এলো।

হাতাটাও গুটিয়ে নেওয়া হলো যাতে হাতটা দেখা যায়। সবশেষে গায়ে সুগন্ধী সেন্ট। যে সেন্টের ঘ্রাণে যুবকদের মাথা ঘুরে যায়। আয়নায় তাকিয়ে আরেকবার মুচকি হেসে বেরিয়ে পড়ল সে।

মুচকি হাসি হাসল শয়তানও।

পর্দা করে তবে...

ভার্সিটির ক্যাম্পাসে সবার সামনে জোরে জোরে ডাকছে বান্ধবীকে। গলার স্বর শুনে সবাই উৎস খুঁজে বেড়ায়। আবার উচ্চৈঃস্বরে হেসে নেয়। সবাই আবার তার দিকে তাকায়। এ রকম করবে না কেন? ছোটবেলা থেকে মাকে দেখেছে রাস্তার মাঝে ছোট ভাইকে বকতে কিংবা বিক্রেতার সাথে জোরে জোরে কথা বলতে।

হিজাব যেন কেবল এক টুকরো কাপড়!

পর্দা করে তবে...

ইন্টারনেটে ঢুকলে সবকিছু ভুলে যায়। এর সাথে মজা করে, ওর সাথে হাসে। হাসি-ঠাট্টা, ফান-ট্রলে হাজার হাজার কমেন্ট-রিয়েক্ট করে বেড়ায়। এমন কিছু বলে যা নিজের বাবা অথবা স্বামীর সামনে বলার মতো সাহস হয় না। এমনকি যাকে অনলাইনে এমনটা বলছে, তাকে সামনা-সামনি দেখলেও এমন বলার সাহস করত না সে। অমুক-তমুকের সাথে চ্যাটে-কমেন্টে এত হাসাহাসি, এত মজা যে, সবাই তাকে নিয়ে হাসতে বাধ্য হয়। কিন্তু দিনশেষে তাকে কেউ সম্মান করে না।

দুঃখজনকভাবে সে নাকি পর্দাও করে!

পর্দা করে তবে...

এমন জামা পরে যেটা জালের মতো। সে মনে মনে ভাবছে পর্দা হচ্ছে। অথচ সবকিছু প্রকাশ পাচ্ছে সুস্পষ্টরূপে।

পর্দা করে তবে...

যার সাথে কথা বলে তার চোখে চোখ রেখে বলে। কখনো চোখের দৃষ্টিতে অন্য কিছু মেশানো থাকে। গলার আওয়াজ খুবই মিষ্টি-মধুর। লিপ্ত হয় উষ্ণ কথাবার্তায়। সহকর্মী বলে কথা!

অথচ সে নাকি পর্দানশিন!

পর্দা করে তবে...

সহকর্মীর পাশে বসে স্বামীর নামে গীবত করে। স্বামীর গোপনীয় কথাও বলে ফেলে; যাতে তার সাথে ফ্রি হওয়া যায়। অনেক গভীর বিষয়ও জানা যায়। দীর্ঘ চ্যাট শুরু হয়। দুজনের মাঝে তৈরি হয় অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কিন্তু দিনশেষে কেউ কাউকে নিয়ে কবরে যাবে না। এমনকি মেয়েটার চোখে-ঠোঁটে মধু থাকলেও না; মেয়েটা সবচেয়ে সুন্দরী হলেও না।

পর্দা করে তবে...

ফেইক আইডি খুলে চ্যাট করতে থাকে। ভালোবাসার জালে আবদ্ধ হয়। রিলেশনে জড়িয়ে পড়ে। উত্তেজনাকর কথাবার্তাও হয়। কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ঠিকই হিজাব পরে। গরিবদের কাছে গিয়ে দান-সাদাকা করে। এই আশায় যে, কিয়ামতের দিন হয়তো জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচবে।

তার পর্দা কেন তাকে অনলাইনের পর্দা করাতে পারল না?

পর্দা করে তবে...

কণ্ঠটা বেশ কর্কশ। কিন্তু ছেলেদের সাথে কথা বলার সময় কঠিনতা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। কণ্ঠ হয়ে যায় বিড়ালের মতো। ফোন ধরার সাথে সাথে মিষ্টি গলায় কথা বলে। মাঝে মাঝে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নেয়। বেশ পারদর্শী অভিনেত্রী।

আচ্ছা, কেন এত রকমফের? সবাই কি পর্দা করছে আদৌ? এ রকম দৃশ্যপট আমরা সবাই দেখেছি হয়তো। দেখে বুঝতে পেরেছি কিছু একটা ঘাপলা আছে। পর্দার প্রকৃত অর্থ তারা বোঝেনি। হয়তো কেউ কেউ সত্যিই পর্দার অর্থ জানে না। এরা কি আসলেই পর্দানশীন?

নাকি পর্দা করে, তবে...

সেই মুহূর্তগুলি

সেই মুহূর্ত

যখন অজু করে বিনয়ের সাথে দাঁড়াই, সালাত শুরু করি তাকবির ধ্বনিতে। চোখ শীতল হয়, প্রশান্ত হয় অন্তর।

সেই মুহূর্ত

যখন হয়ে যাই এক সংরক্ষিত মুক্তোদানা। লম্বা বোরকায় নিজেকে আবৃত করে পথ চলি। কোনো মুগ্ধ দৃষ্টি আমায় কুরে কুরে খায় না, এ নিয়ে আমাকে ভাবতেও হয় না। আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমার জন্য যথেষ্ট।

সেই মুহূর্ত

যখন মায়ের হাতে চুমু দিতে ঝুঁকে পড়ি। মা আমার প্রতি রাজি-খুশি হয়ে যান। আমি যখন অন্যদিকে ফিরি, তখন তার দুআ মেঘমালা ভেদ করে উড়ে চলে সুউচ্চ আসমানে। আমার মা তখন আসমানের রবের কাছে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করেন। প্রশান্ত হয় আমার অন্তর।

সেই মুহূর্ত

যখন বাবা আমার চরিত্র নিয়ে গর্ব করেন। ভরসা রাখেন আমার আচার-ব্যবহারে, সততা ও বিশ্বস্ততায়। আমিও নিজেকে রক্ষা করে চলি, যেন তিনি আমাকে রেখে নিশ্চিন্ত মনে চলে যান। কারণ, তিনি জানেন আমি পবিত্র।

সেই মুহূর্ত

যখন একজন নেককার বান্দা আমার সঙ্গী। আমরা একত্রে কুরআনের সুধা পান করি, আস্বাদন করি ঈমানের স্বাদ। একই সাথে ছুটে চলি রবের নির্দেশিত পথে।

সেই মুহূর্ত

যখন আমার হাত থাকে ইয়াতিমের মাথার ওপর, যখন এ হাত নিঃস্বদের সাহায্য করে, বোঝা বহন করে কোনো বিধবার। যখন তাদের সংকীর্ণতার মুহূর্তে আমি প্রশস্ত হয়ে দাঁড়াতে পারি। তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে যখন হতে পারি এক ঝলক আলো।

সেই মুহূর্ত

যখন হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা সংরক্ষণ করে রাখি নেক সঙ্গীর জন্য; যতক্ষণ না সে আসে, অবমুক্ত করে আমার পবিত্র অনুভূতি।

সেই মুহূর্ত

যখন আমি ব্যথিত মানুষের অশ্রু মুছে দিই, তাদের অন্তরে বুনে দিই আশার বীজ। যখন তার অশ্রুসিক্ত মুখে ফুটে ওঠে মুচকি হাসি। মনে মনে খুশি হই কল্যাণকর কিছু করতে পেরে।

সেই মুহূর্ত

যখন আমার মস্তক জমিনে ঠেকে। আমি সিজদা করি কেবল আমার রবের জন্যই, অন্য কারও জন্য নয়।

সেই মুহূর্ত

যখন আমি জানতে পারি, আনন্দের মুহূর্ত দেরিতে হলেও আসবে। আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষমাণ আছে সেই আল্লাহর কাছে যিনি আমাকে আশাহত করবেন না।

সেই মুহূর্ত

যখন নিজের একাকিত্বেও মন খারাপ হয় না। কেননা আসমানে চাঁদও একাকী, তবু কী সুন্দর!

সেই মুহূর্ত

যখন আমি একা বসে বিনয়ের সাথে হাত তুলি। চাইতে থাকি মহান রবের কাছে। ফলে ধরা দেয় সুখ-সমৃদ্ধি। আমার চাওয়া-পাওয়া যেন এক প্রজাপতির মতো হয়ে যায়—তাড়া করলেই উড়ে যাবে যেন! কিন্তু রবের ওপর ভরসা করেছি আমি। তাই সে আবার অনুগত হয়ে আমার আঙুলের ওপরই বসবে।

সেই মুহূর্ত

যখন আমি অনুভব করতে পারি—কোনো কিছুর জন্যই আমার ব্যথিত হওয়া মানায় না, কেবল আমার গুনাহর জন্য ছাড়া। তাই সর্বদা 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে চলি; হয়তো আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

সেই মুহূর্ত

যখন নিজ হাত দিয়ে উপকারী কিছু করি। আঙুল দিয়ে তাসবিহ পাঠ করি। হাত দিয়ে দান করি অথবা কারও প্রতি দয়া করি কিংবা রবকে সন্তুষ্ট করে এমন কিছু লিখি। ফলে কিয়ামতের দিন এই হাতকে যখন আল্লাহ কথা বলতে বলবেন, তখন আমার পক্ষে সুপারিশ করার মতো কিছু পাব। এ হাত আমার সৎকর্মের বিবরণ দেবে। আবার আমি যে পাপ করেছি তা-ও তুলে ধরবে।

সেই মুহূর্ত

যখন অনুভব করি গুনাহ করলেও, ভুল করলেও, দূরে সরে গেলেও সঠিক পথেই আছি। যতই হোঁচট খাই না কেন, দিনশেষে আমি গন্তব্যে পৌঁছাবই আল্লাহর ইচ্ছায়। কারণ, আমি যে সুপথ বেছে নিয়েছি। সিজদায় গিয়ে আমার রব, আমার প্রিয় পরম করুণাময়ের কাছে তা চেয়ে নিয়েছি।

সেই মুহূর্ত

এই মুহূর্তের কথা লিখে শেষ করবার মতো নয়! কারণ, আল্লাহর আনুগত্যে এমন স্বাদ—যা বর্ণনা করা যায় না। আল্লাহকে মেনে চলায় এমন আনন্দ—যা ভাষায় রূপ দেওয়া সম্ভব না।

হায়, যদি আমি পুরুষ হতাম!

হায়, যদি আমি পুরুষ হতাম!

তবে ছুটে যেতাম মসজিদের পানে। তখনও শরীরটা অজুর পানিতে ভেজা। বাইরের ঠান্ডা বাতাস শরীরে পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। ছুটে যেতাম কেবলার দিকে। উচ্চ আওয়াজে আযান দিতাম, ‘আল্লাহু আকবার!’

ইয়া আল্লাহ! কী সুন্দর! কী চমৎকার!

হায়, যদি আমি পুরুষ হতাম!

তবে দিনে পাঁচবার সেই মসজিদটাতে আগেভাগে যেতাম, যেটা আমার রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায়। আমার প্রতিটি পদক্ষেপে যোগ হতো নেকি আর মুছে যেত পাপরাশি। আমি ছুটে যেতাম, আমার হৃদয় কেঁপে উঠত। ইমামের পেছনে প্রথম কাতারে জায়গা করে নিতাম। ঠোঁট নেড়ে ‘আমীন’ বলতাম। আমার আওয়াজ মিশে যেত ফেরেশতাদের আওয়াজের সাথে। আল্লাহর রহমত আমার ওপর নেমে আসত মুষলধারায়।

হায়, যদি আমি পুরুষ হতাম!

তবে প্রতিদিন আমার জন্য অপেক্ষা করত একজন উত্তম স্ত্রী। তাকে আমি নিজে পছন্দ করে নিতাম। ভালোবাসতাম। তার দায়িত্ব থাকত আমার কাঁধে। সে হতো

আমার অনুগত। আমার জন্য খাবার প্রস্তুত করত। আমার কাপড় ধুয়ে দিত। রাজ্যের দেখাশোনা করত আমার। সারাদিন কাজ শেষে ঘুমানোর পরিবেশ তৈরি করে দিত।

তারপর জেগে উঠতাম ধূমায়িত চায়ের ধোঁয়ায়। মজা করে চুমুকে চুমুকে পান করে চলতাম। সে বসে থাকত আমার পাশে। আমি থাকতাম রাজার হালে।

হায়, যদি আমি পুরুষ হতাম!

হতাম পবিত্র দ্বীনদার একজন যুবক। চোখ নামিয়ে চলতাম। শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতাম গুনাহ থেকে। মুখভঙ্গিতে প্রকাশ পেত হিদায়াতের বার্তা। চলতি পথে জমিনের সবাই আমাকে পছন্দ করত। হাত মেলাতাম সবার সাথে। ঘুমাতাম নিশ্চিন্ত মনে। কারণ, আমার জন্য এক হূরে-ঈন প্রস্তুতি নিচ্ছে, সাজগোছ করছে। আহা! হূরে-ঈন কতই না মিষ্টি!

হায়, যদি আমি পুরুষ হতাম!

যে-কোনো জায়গায় ঝুট-ঝামেলা ছাড়াই অজু করতে পারতাম। হিজাব খুলে গেলে মাথার চুল প্রকাশিত হয়ে যাবে—এমন ভয় থাকত না। পুরুষ হলে কী সহজেই হয়ে যেত!

হায়! যদি আমি পুরুষ হতাম!

তাহলে পায়জামা পরে সাগরপাড়ে হেঁটে যেতাম। জোরে হাসতাম। কেউ আমাকে কিছু বলত না। সমুদ্রের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, সাঁতার কেটে উপভোগ করতাম। গরমের ছুটি কাটাতাম চমৎকারভাবে। যদি পুরুষ হতাম!

হায়, যদি আমি পুরুষ হতাম!

সন্তানেরা আমাকে 'বাবা' বলে ডাকত। যদিও আমি তাদের নয় মাস পেটে ধরিনি, দুধ পান করাইনি, জামা-কাপড় বদলে দিইনি, শীতের রাতে তাদের জন্য ঘুম থেকে উঠে যাইনি; তবুও তো এ ডাক শোনার অধিকার থাকত!

হায়, যদি আমি পুরুষ হতাম!

পছন্দের সব খেলাধুলা করতে পারতাম। ছুটে চলতাম সাদা ঘোড়ার পিঠে। ভ্রমণ করতাম যেখানে খুশি!

হায়, যদি আমি পুরুষ হতাম!

তাহলে গর্বভরে বলতে পারতাম নবি-রাসুলরা পুরুষ ছিলেন। যে সম্প্রদায় নারীকে নেতৃত্বের আসনে বসায় তারা সফল হয় না—এ কথা জানাতাম।

কিন্তু

আমি এমন পুরুষ হতে চাই না, যে এই নিআমতগুলো জানে না। হয়তো আমি পুরুষ হলে স্ত্রীর ওপর জুলুম করতাম। তাকে বারবার হুমকি দিতাম যে, আমি আরেকটা বিয়ে করব। হয়তো আমি পুরুষ হলে ঘুমাতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম টিভি-কম্পিউটারের সামনে। সালাত আদায় করতাম না মসজিদে গিয়ে।

হয়তো আমি পুরুষ হলে মেয়েদের ফিতনায় পড়তাম। চোখের হিফাযত করতাম না, অন্তর পচে যেত। উদাসীন হয়ে পতিত হতাম ধ্বংসের মুখে। হয়তো আমি পুরুষ হলে এমন বাবা হতাম যে থেকেও নেই। হয়তো আমি পুরুষ হলে এমন বিভ্রান্ত যুবক হতাম যার কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। হয়তো আমি পুরুষ হলে এমন হতাম যার অস্তিত্ব থাকলেও যেন অস্তিত্বহীন।

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমি একজন নারী। হে আল্লাহ, আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা!

একজন নারী স্বামীর সেবা করেও এ সমস্ত নেকীর অধিকারী হতে পারে! সর্বদা বলে যাব, আল্লাহ! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা!

চমৎকার অনুভূতি

কী চমৎকার অনুভূতি!

দাঁড়িয়ে আছি আতঙ্কে। আর সবাইও অপেক্ষা করছে ভয়ে ভয়ে। চারদিকে বিরাজ করছে অপরিসীম নীরবতা। হতচকিত হয়ে আছি, দুআ পড়ছি। রহমানের কাছে চলছে কাকুতি-মিনতি, যাতে আমার গুনাহগুলো গোপন রাখেন। দূর থেকে আওয়াজ শোনা যায়। পাশ দিয়ে কে যেন আসে। শরীর কেঁপে ওঠে ভয়ে। হঠাৎ আমার হাত উঠল। খুলে গেল মুষ্ঠি। ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হলো। প্রশান্ত হলো মন। আনন্দিত হলো হৃদয়। ফেরেশতারা আমায় নিয়ে খুশি। তারা পরম করুণার সাথে বলছে, 'তোমার আমলনামা পড়ো।'

কী চমৎকার অনুভূতি!

কোনো একটি গুনাহ জেনে করতাম, পরে তাওবা করেছিলাম আন্তরিকভাবে। সে কথা আমার বিবেক জানে। জানে আমার হৃদয়। শরীরের কাছেও তা অজ্ঞাত নয়। হিসেব-নিকেশের দিন দেখব পরম করুণাময় রব সে গুনাহ ঢেকে দিয়েছেন। তারপর স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; অথচ আমারই মনে ছিল না সেটা। আমার সব গুনাহকে তিনি পরিবর্তন করে দিয়েছেন নেকিতে। কী চমৎকার অনুভূতি হবে তখন! যে তাওবার কারণে আমি নবজীবন লাভ করব, অনন্তকাল বসবাস করব জান্নাতে।

কী চমৎকার অনুভূতি!

যখন হাউজ দেখতে পাব। পিপাসায় কাতর আমি। ছুটে চলেছি তার উদ্দেশে। সবাই ভিড় করছে। একে অপরকে ঠেলে দিচ্ছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় চিৎকার করে কাঁদছি। হঠাৎ ফেরেশতাদের ডাক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উজ্জ্বল চেহারা। তিনি আমায় চিনতে পেরেছেন। আমিও চিনতে পেরেছি তাকে।

তাকে আগে কখনো দেখিনি, তবুও।

তখন সারিগুলো অতিক্রম করে সামনে চলে যাব। তিনি বাড়িয়ে দেবেন পবিত্র হাত। তার হাত স্পর্শ করবে আমার হাতকে। তিনি পান করাবেন। এরপর আর কখনো পিপাসার্ত হব না আমি। নবিজির সাথে দেখা হওয়ার অনুভূতিটা কী চমৎকারই না হবে!

কী চমৎকার অনুভূতি!

যখন কোনো এক আহ্বানকারী ডাকবে, 'হে জান্নাতবাসী! তোমাদের সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ করবেন।' ভয়ে বিগলিত হয়ে যাব আমি। আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ! মহীয়ান-গরীয়ান 'আর-রহমান'-এর সাথে দেখা! আর আমিই-বা কে যে সেই সুমহান সত্তার সাথে দেখা করব!

মিছিলে হেঁটে যাব আমি। মন পুলকিত। আনন্দে হাসতে থাকব। তারপর মাথা তুলব। যে চোখ দিয়ে কখনো হারাম দেখিনি, সেই চোখ তুলে তাকাব। আল্লাহ সরিয়ে দেবেন পর্দা। আমি চেয়ে রইব। চেয়েই রইব। যত খুশি দেখে নেব। কেঁপে উঠবে শরীর। বিনীত হয়ে উঠবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এমন এক নতুন স্বাদ অনুভব করব যা আগে পাইনি কক্ষনো। চোখ মুদতে পারব না। পারব না মাথাটাও নাড়াতে। নিঃশ্বাস পর্যন্ত থেমে যাবে। মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার ক্ষণে অশ্রু গড়াবে চোখ বেয়ে। কী চমৎকার অনুভূতি আল্লাহকে দেখার মাঝে! ইয়া আল্লাহ!

কী চমৎকার অনুভূতি!

যখন আমি আকাঙ্ক্ষী হব আল্লাহর প্রতি। আর তাই আগ্রহী হব সালাত আদায়ে। কারণ—সালাত যে তাঁরই সামনে দাঁড়ানোর নাম।

আকাঙ্ক্ষী হব কুরআন পড়তে। কুরআন যে তারই কথা!

ভালোবাসব রাত্রিকে। তখন যে তিনি আমায় ডাকেন!

অপেক্ষা করব দিনের জন্য। তখন যে তিনি সব দিয়ে যান অকাতরে!

পছন্দ করব আযানের ধ্বনি। আযান যে তাঁরই আহ্বান!

ভালোবাসব প্রিয় নবিজিকে। তিনি যে তাঁরই প্রিয়জন!

কামনা করব জান্নাত। সেখানে যে তাঁকেই দেখা যাবে!

দিন গুনব মৃত্যুর। এরপরই যে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ!

কী চমৎকার সেই অনুভূতি! আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে!

মার্জিনের ওপাশে

স্কুল-মাদরাসায় আমরা শিখেছি, মার্জিন টেনে লিখতে হয়। কখনো আমরা মার্জিনের ওপাশটা ফাঁকা রেখে দিই। কখনো সেখানে আঁকিবুঁকি করি। আবার কখনো ছোট করে সেখানে কিছু 'নোট' বা 'ব্যাখ্যা' লিখে রাখি। জীবনের মার্জিনে এ রকম অনেক লুকায়িত মুখ আছে। আমরা তাদের পড়তে ভুলে যাই। কিন্তু জীবন-কলম তাদের নাম মার্জিনের ওপাশটাতে লিখে রাখে।

প্রিয় ভাই, ছেলেটা প্রতিদিন তোমায় দেখে। তার সতর্ক দুটি চোখে। যখন তুমি সুগন্ধি মেখে দামি জামাটা পরে তার সামনে দিয়ে হেঁটে চলো। যখন তোমার ফোনকল বেজে ওঠে, তখন ছেলেটা চোখ বুজে উপভোগ করে নেয় সেই আতরের ঘ্রাণ। তোমাকে দেখে সে আল্লাহকে ডাকে। তোমার নিআমতগুলো রবের দরবারে চেয়ে বসে। তুমি যখন চলে যাও পাশ কাটিয়ে, তখন আফসোসের সীমা থাকে না তার। একবার মার্জিনের ওপাশে তাকিয়ে তাকে সালাম দিলেই তো পারতে! পারতে এক শিশি আতর উপহার দিতে। সে তো তোমার মতোই যুবক।

প্রিয় বোন, মেয়েটা পায়ের আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারে যে এটা তুমি। রঙিন স্বপ্নে ভরা মাথাটা বাড়িয়ে দেয় স্টোর রুম থেকে, আলগোছে দেখে নেয় তোমাকে। তুমি যখন বাড়িতে প্রবেশ করো, তোমার জুতার দিকে তাকিয়ে তার ভ্রু উঁচু হয়ে যায়। তোমার বাহারি রঙের জামার দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়। গলার হারটা ক্ষণিকের জন্য নজর কেড়ে নেয় তার। হঠাৎ খেয়াল হয় যে চুলায় চা বসিয়েছে। সে ছুটে গিয়ে আগুন নিভিয়ে দেয়। তার ব্যথিত হৃদয়কে পুড়িয়ে দেওয়ার আগেই। হায়! তুমি

মার্জিনের ওপাশে তাকালেই কি ভালো করতে না? তার দিকে মুচকি হাসি হেসে তাকে একটা জামা, একটা হার আর এক জোড়া জুতা উপহার দিতে! হয়তো তা-ই হয়ে থাকত রঙিন জ্বলজ্বলে স্মৃতি!

প্রতিদিন তোমার গাড়ির আওয়াজ শুনলেই ছুটে আসে লোকটা। তোমার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নেয় নিজ হাতে। ফলের প্যাকেটও হাতে ধরে। তোমার পেছনে পেছনে নীরবে-নিভৃতি সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে। ওপরে ওঠার পর তুমি তাকে এক টাকা দাও। আর সে সরে পড়ে তোমার সামনে থেকে। রাস্তায় এসে জামাটাতে ধুলাবালি মেখে নেয়। যাতে শরীর থেকে ফলের গন্ধ চলে যায়। না হলে তার বাচ্চাটা সেই গন্ধ শুঁকে ফল চেয়ে বসবে। হায়! তুমি যদি একবার তাকিয়ে দেখতে মার্জিনের ওপাশে! তবে দেখতে ফলের গন্ধ লুকোতে গিয়ে সে জামার কী হাল করেছে। তাকে যদি কিছু ফল একবার উপহার দিতে!

সে খুব সুন্দর না, আবার হ্যান্ডসামও না। ভালো পরিবার থেকেও আসেনি। দুনিয়া সম্পর্কে তুমি যা জানো, ততটা সে জানে না। কিন্তু তোমার সাথে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। স্বভাবতই তোমার পাশে বসে যায়। অথচ তুমি তার পাশ থেকে উঠে গিয়ে হাই-প্রোফাইল ছেলেদের সাথে বসো। সে চায় তোমার আর তোমার বন্ধুদের সাহচর্য। কোনো কিছু পাওয়ার আশায় নয়, যথেষ্ট আত্মমর্যাদা তার। তবে সে একাকিত্বে ভোগে। এটা তার দোষ না। তুমি মার্জিনের ওপাশটাতে যদি তার দিকে তাকাতে! তার সাথে চোখাচোখি করে সালাম দিতে! তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসতে! তবে রহমত নাজিল হতো তোমাদের দুজনের ওপর।

মেয়েটা প্রতিদিন এক জায়গায় বসে থাকে। পথচারীদের ডেকে ডেকে বিক্রি করার চেষ্টা করে। মুচকি হেসে তোমাকে সম্মান জানায়; হয়তো তুমি খুশি হয়ে কিছু কিনবে। কেউ হয়তো তার থেকে কিনে নেয়, দরদাম করে না। আবার কেউ এমন কথা বলে টাকা ছুড়ে দেয় যা শুনে সে আঘাত পায়। কিছুটা বিরক্তি ও সংকোচের সাথে তুলে নেয় টাকা। তার যত আয় হয় তা জমা করলে তোমার মোবাইল কেন, একটা চশমা কেনারও টাকা হবে না। হায়! যদি তুমি তার থেকে কিছু কিনতে। যদি তাকে সম্মানের সাথে টাকা দিতে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। তাহলে দেখতে সে দুআ করে দিচ্ছে আল্লাহর কাছে; যেন তিনি তোমাকে রক্ষা করেন, তোমাকে অসুস্থতার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেন।

এই যে মানুষগুলো... গাড়ির ড্রাইভার, সুইপার, গৃহকর্মী, পথশিশু, রুটি-বিক্রেতা, ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী। এরা যে সাধারণ মানুষ, তাতে কোনো দোষ নেই। আবার তুমি যে ধনী বা স্বচ্ছল কিংবা শিক্ষিত সেটাও তোমার দোষ না। তুমি তো রিযিক বণ্টন করো না। নিআমতের অধিকারী হলে আফসোসের কিছু নেই। আমাদের কেবল মার্জিনের ওপাশে তাকাতে হবে।

তাহলে হয়তো তাদের আমরা স্পষ্ট দেখতে পাব। তাদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেব। আমাদের হৃদয়ে বরকত নাজিল হবে। অভিযোগ করা বন্ধ হবে, যখন দেখব এত এত নিআমত পেয়েও যে আমরা নিজেদের সুখী মনে করি না।

কারণ, প্রকৃতপক্ষে সুখ লুকায়িত ওই মুখগুলোর ভেতরে। আমরা সেগুলো দেখতে পারব না, অনুভবও করতে পারব না, যতক্ষণ না মার্জিনের ওপাশে তাকাই।

কতই না ভালো হতো!

কতই না ভালো হতো!

যদি সিদ্ধান্ত নিতে কাছের মসজিদে ফজরের সালাত আদায় করবে। তাই রাতেই জেগে উঠলে। যাতে লাভ করতে পারো এই সুমহান মর্যাদা! অবশেষে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লে। হাঁটতে লাগলে অমানিশা ভেদ করে। আল্লাহর দেওয়া নূর জ্বলে উঠল তোমার অন্তরে। একটা করে পা ফেলে তুমি পৌঁছে গেলে। কতই না ভালো হলো! তোমার হৃদয়ের ভেতরে এক অনন্য অনুভূতি। হ্যাঁ, এখন বুকের যেখানটাতে হাত দিয়েছ সেখানেই!

কতই না ভালো হতো!

যদি তুমি হতে নীরব শ্রোতা, যদি অশ্রু ঝরত তোমার দু-চোখ বেয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন শাইখ মিম্বরে দাঁড়িয়ে আলোচনা করেন, বর্ষিত হতে থাকে রহমতের বারিধারা। কতই না ভালো হতো যদি তোমার মনে জন্মাত আল্লাহকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা। ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন শাইখ জান্নাতের বর্ণনা দেন। কারণ, তুমি যে আল্লাহকে ভালোবাসো!

কতই না ভালো হতো!

যদি রামাদান ছাড়া তুমি নফল সাওমের নিয়ত করতে। ক্লান্তি অনুভব করছ তুমি। পিপাসায় গলা কাঠের মতো শুকিয়ে গেছে। শরীরটা কেমন মিইয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণের জন্য চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলে। অবশেষে ঘনিয়ে এলো ইফতারের ক্ষণ। খেজুর তুলে নিলে। তা মুখে পুরবার আগেই পেলে চোখ-গড়ানো নোনা জলের স্বাদ।

কতই না ভালো হতো!

যদি কোনো দ্বীনি ভাইকে প্রথমবারের মতো জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করতে পারতে। উভয়েই স্মরণ করতে আল্লাহকে। তার কাঁধে ফিসফিস করে কাঁপা গলায় বলতে, 'উহিব্বুকা ফিল্লাহ'!

কতই না ভালো হতো!

যদি তুমি ফিরে যেতে চাইতে রবের কাছে। কোনো অশ্রুভেজা তিলাওয়াত শুনে ঢুকে পড়লে আয়াতের আঙিনায়। প্রতিটি হরফের মাঝে বিচরণ করলে তুমি। বিগলিত হলো তোমার অন্তর। হৃদয়টা উড়ে চলে গেল জান্নাতে। তার আশপাশটা ঘুরে এলো যেন। নাড়া দিল তোমার অন্তরকে। তুমি কাঁদলে আর কাঁদলে। কেঁদেই চললে অবিরাম!

কতই না ভালো হতো!

যদি তুমি বহন করতে কোনো ইয়াতিমের বোঝা। সে হাসলে তার নিষ্পাপ চেহারাটা উদ্ভাসিত হতো। তার চোখ মিলিত হতো তোমার দুচোখে। আনন্দের ঝলকানিতে অবগাহন করতে দুজন।

কতই না ভালো হতো!

যদি সালাতে তোমার ভাইয়ের পাশে দাঁড়াতে। কাঁধে কাঁধ মেলাতে। সিজদায় গেলে দুজনেই অবনত করতে মাথা। মাটিতে মিশে যেত পাশাপাশি দুটি কপাল। আসমানে উড়ে চলত কিছু দুআ। কখনো বিচ্ছিন্ন, কখনো মিলিত। কবুল হতো আল্লাহর দরবারে।

কতই না ভালো হতো!

যদি তুমি আল্লাহ সুবহানাহুর সামনে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় থাকতে। প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে আযানের ধ্বনি শুনবার। হঠাৎ শূন্য ভেদ করে সেই সুমহান আওয়াজ ভেসে আসল। ভেঙে গেল নীরবতা। কেঁপে উঠল তোমার ভেতরটা। কতই না ভালো হতো, যদি তুমি জায়নামাযের দিকে ছুটে যেতে। বিনয়ের সাথে দিতে তাকবির ধ্বনি—'আল্লাহু আকবার'।

কতই না ভালো হতো!

যদি তুমি অপেক্ষা করতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎলাভের, তার সাহচর্য লাভের। না দেখেই ভালোবেসে ফেলতে তার চেহারাকে। কতই না ভালো হতো, যদি তার কথা ও কাজ তোমাকে টানত। সাহাবিদের জন্য তিনি কেঁদেছেন শুনে তোমার মাঝে ঈর্ষা হতো। কতই না ভালো হতো, যদি তুমি তার হাত ছুঁয়ে দেখার জন্য কেঁদে উঠতে।

কতই না ভালো হতো!

যদি গুনাহ করে ব্যথিত হতো তোমার হৃদয়। তারপর ক্ষমা চাইতে আল্লাহর কাছে। কারণ, তুমি জানো, আল্লাহ সেটা ক্ষমা করে দেবেন। তোমার দোষ-ত্রুটি তিনি গোপন রাখবেন। তারপরও তোমার ভয় হয় যে, এ গুনাহর শাস্তি হয়তো আল্লাহ পিছিয়ে রাখছেন। তাই তুমি কান্নায় ভেঙে পড়লে তাঁর কাছে আবারও তাওবাহ করলে।

কতই না ভালো হতো!

যদি তুমি পৌঁছে যেতে মক্কায়। দূর থেকে চোখে পড়ত কাবাঘর। তার চারদিকে তাওয়াফ করতে। তারপর সাঈ। দৌড়াতে দুটি পাহাড়ের মাঝে। তারপর কেঁদে ফেলতে তুমি। রবের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ হতো তোমার। তুমি ভালোবেসে ফেলতে তাঁকে। সকল কিছুর মাঝে তাঁরই নিদর্শন দেখতে পেতে। কতই না ভালো হতো, প্রতি মুহূর্তে যদি নতুন করে জীবনের স্বাদ পেতে। কারণ, তুমি যে তাঁকে ভালোবাসো!

তৃতীয় অধ্যায়

সুখের পানে

শুভ্র ফুল

সে এক মুসলিম নারী! শুভ্র ফুলের মতো, যে ফুল আলোকিত হয়েছে রহমানের আলোয়। যে ফুল বেড়ে উঠেছে কুরআন-প্রেমিকের ঘরে। ফলে স্বচ্ছ হয়েছে বৃষ্টির পানির মতো, হয়েছে পবিত্র। তার স্বচ্ছতা যেন দুধের রং, যেন চাঁদের আলো।

ফুলেরা সুবাস ছড়িয়ে যায় যুগ যুগ ধরে। সমগ্র বিশ্বকে ভরিয়ে দেয় অপরূপ সৌন্দর্যে। আচ্ছন্ন করে কবিকুলকে। তাদের কবিতায় ফুটে ওঠে ফুলেদের হৃদয়কাড়া বর্ণনা। সুখের অনাবিল ধারা প্রবাহিত হয়। ভরে যায় মন ও প্রাণ।

আমরা যেন বাবার ঘরে শুভ্র ফুলের মতো বাড়তে থাকি। প্রতিদিন তার হাতেই যেন ফুলের মতো পাপড়ি মেলি। তার স্নেহমাখা হাতে মেখে দিই আনুগত্যের সুবাস। অনুগ্রহভরে হাত রাখি মায়ের কাঁধে। পরম মমতায় বোনকে দিই অনাবিল সুখ। ঘুচিয়ে দিই সব দুঃখ-বেদনা, মুছে দিই চোখের পানি। কারণ, আমরা যে এক একটা ফুল। শুভ্র ফুল।

ফুলের মর্যাদা আছে। ফুলের সৌন্দর্য দৃঢ়তায়। শ্রেষ্ঠত্ব আসমানের রবের দিকে ফিরে তাঁকে ডাকার মাঝে। তাই ফুল কেবল সূর্যের স্পষ্ট আলোতেই পাপড়ি মেলে। এমনটাই আমি, আমরা।

ফুল বড় লজ্জাশীল। সলজ্জ ভঙ্গিতে তার পাপড়িগুলো দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে, যতক্ষণ না বসন্ত আসে। এমনটা আমরাও। তাই তো হিজাবে নিজেকে আবৃত রাখব, যতক্ষণ না বসন্তের মতো একজন নেককার স্বামী আসে।

ফুলের দৃঢ় শেকড় থাকে। জমিনের গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত শেকড়। মৃদুমন্দ বাতাসে তা নড়ে যায়। কিন্তু কখনো তা শেকড় ছেড়ে যায় না। কারণ, সে যে জমিনকে ভালোবাসে। আর জমিনও তাকে ভালোবাসে। এমনটাই আমরা। তাই তো রবের সামনে অবনত হই, মজবুত করি ঈমানের শেকড়। এই শেকড়েই নিরাপত্তা, রবের পক্ষ থেকে।

ফুলের আছে বিনয়। সৌন্দর্যের যত প্রতীক, যত ধরন—সবটা ধারণ করে এই ফুল। তবুও সে গর্ব করে না। অপরকে বুঝতে দেয় না নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। নীরবে-নিভৃতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলে। কারণ, সে যে একটা ফুল। আমরাও এমন।

ফুল বদান্য। সে নিজের সবুজ পাতাগুলির প্রতিও কৃপণতা করে না। তাই তো নিজের শরীরে জমে থাকা শিশিরবিন্দুও বিলিয়ে দেয় পাতাকে। আর আমাদের সুগন্ধ-সুবাস দিয়ে আনন্দিত করে, সুস্থ রাখে। আমরা মেয়েরাও এমন।

ফুল নীরব-নিশ্চুপ। ধীরে ধীরে সে বড় হয়। কোমলতার সাথে সে মাথা তুলে তাকায়। যাতে কেউ চমকে না যায়। দিনে-দিনে সে বেড়ে ওঠে। অনন্য হয় সৌন্দর্যে, সতেজতায়। আমরাও যে এমনই। নারীত্ব এসেছে বলেই তাড়াহুড়ো করা মানায় না আমাদের। ফুলের মতো ধৈর্য ধরব। আস্তে আস্তে সৌন্দর্য পূর্ণতা পাবে, ততদিন অপেক্ষায় রইব।

যথাসময়ের পূর্বে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় চলে যাব না। না হলে জীবনের অনেক কিছু শেখা বাকি রয়ে যাবে। কেননা জীবনের প্রতিটি ধাপের অনেক আনন্দ-সুখ আছে, অনেক কিছু শিখে নেওয়ার আছে।

কখনো যেন মনে না করি, নারীত্ব মানেই হাই-হিল পরা, নারীত্ব মানেই ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক কিংবা আঁটসাঁট কাপড় পরিধান করা। বরং নারীত্ব হলো কোমল আচরণ। জীবনের সমস্ত ব্যাপারে উত্তম রুচির পরিচয় দেওয়া। নারীত্ব কেবল পোশাকে নয়। নারীত্ব চিন্তায়, কথাবার্তায়, উত্তম আচরণে ও আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী ইলম অর্জনে।

তাই হতে হবে শুভ্র সফেদ ফুলের মতো, যে ফুল তার সুবাস ধরে রাখে বসন্ত আসার আগ পর্যন্ত।

স্বপ্নের রাজকুমার

‘অনেক দিন আগের কথা।’ নবিজির নামে দরূদ পড়ে শুরু করা যাক।

পিচ্চি মেয়েটা বিছানায় শুয়ে আছে। গোলাপি রঙের বালিশটাতে ছড়িয়ে আছে তার চুল, মাঝে তার চাঁদপনা মুখ। চোখে নিষ্পাপ দৃষ্টি। ঘুমের আগে সে দাদির কাছে গল্প শুনছে। দাদি চান গল্পে গল্পেই গড়ে উঠুক ছোট্ট নাতনীর মূল্যবোধ।

তাকে শোনান সুন্দর প্রেমের গল্প। স্নেহভরা কণ্ঠে। তাতে মিশে আছে বার্ধক্যের রুক্ষতা। এক সুন্দরী রাজকুমারীর গল্প। কীভাবে প্রথম দেখায় তাকে ভালোবেসে ফেলে এক রাজকুমার। তারপর সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে তার কাছে যায়। হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় সুন্দর জামা পরিহিতা রাজকুমারীকে। একত্রে তারা দুর্গে পৌঁছে। তারপর তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে শুরু করে। তাদের ঘরভরতি ছেলে-মেয়ে আসে... ইত্যাদি।

শিশু মেয়েটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তার স্বপ্নের রাজকুমারকে নিয়ে। সে কেমন হবে? শক্তিশালী? সুদর্শন? ব্যক্তিত্বসম্পন্ন? প্রেমময়? দ্বীনদার? অর্থ-বিত্তের মালিক? নাকি ভিন্ন কিছু? এমন রাজকুমারের গল্প শুনে মেয়েরা নানান চিন্তায় ভোগে। আন্তার-আব্‌লা, রোমিও-জুলিয়েট, কাইস-লাইলার মতো তারও যেন একজন রাজকুমার আছে, যাকে কেন্দ্র করে তার জীবন।

মেয়েটা অপেক্ষা করে কবে তার দরজায় ঠিক এভাবেই কোনো রাজকুমার আসবে। হাঁটু গেড়ে জানাবে, সে ‘এসে গেছে’!

এই যে রাজকুমার আসবে—এ যে শুধুই অলীক কল্পনা; তা মেয়েরা বুঝতে পারে অনেক দেরিতে। ততদিনে হয়তো সময় ফুরিয়ে গেছে।

মেয়েরা বুঁদ হয়ে থাকে নানান কল্পনায়। অতঃপর, তুলনা চলে স্বামীর সাথে। কল্পনা আর বাস্তবতার ফারাকে মেয়ের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। তার স্বপ্নের কল্পিত রাজকুমার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সে বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করে না। হাতের কাছে যে সম্পদ আছে তার গুরুত্ব বোঝে না। কারণ, সে যে রাজকুমারের স্বপ্নে বিভোর। সে মনে করে এই অতি সাধারণ ভদ্র ছেলেটা তার স্বপ্নের রাজকুমার হতে পারে না। দুঃখজনক!

আরও দুঃখজনক যখন কোনো মেয়ে একটা ছেলেকে ফিরিয়ে দেয় সার্টিফিকেটের অভাবে, কিংবা নাকটা বেমানান বলে, ছেলেটা মোটা বা কালো হওয়াতে। অথবা ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার নয় তাই। কিংবা সে কৃষকের ছেলে অথবা আধুনিক জামা কাপড় পরে না বলে।

সুবহানাল্লাহ!

সাইয়্যিদুনা মুসা আলাইহিস সালামের গায়ের রং কালো। লোকমান হাকিমেরও। কৃষ্ণত্ব কোনো দোষ নয়। প্রকৃত রাজকুমার সেই যুবক যে পবিত্র, আল্লাহভীরু, ভদ্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। যে যুবক বড় হয়েছে আল্লাহর ইবাদতে। অজুর পানি ছিল যার আতর। সে কারও জীবনে এলে তার আগে ফেরেশতারা তার কাছে আসে। আর কাউকে ছেড়ে চলে গেলে রেখে যায় উত্তম কিছু স্মৃতি। তার কথাবার্তায় খুঁজে পাওয়া যায় আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ। কথা বলার সময় তার মুখে থাকে 'তাসবিহ'। তার প্রতিটা কথোকপথন হয় কৃতজ্ঞতা, বিস্ময়, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা, ক্ষমা চাওয়ার নিদর্শন। আসতে-যেতে সে কেবল ঐশী কথাবার্তাই বলে।

কোনো মেয়ের কাছে এমন ছেলে এলে মেয়েটা হয় রানি। কারণ, নিজ রাজত্বে সে তাকে বসাবে রানির আসনে। সকল সৌন্দর্য থেকে নিজের দৃষ্টিকে সংরক্ষণ করে চলবে সে। কেবল চোখ রাখবে স্ত্রীর দুচোখে। এর আগে সে কোনো স্বাদ উপভোগ করেনি, স্ত্রী-ই তার প্রথম স্বাদ, প্রথম ভালোবাসা।

হতে পারে সে অত ধনী নয়, কিন্তু সে যার স্বামী হবে, সে অবশ্যই ধনী। হতে পারে স্ত্রীর দৃষ্টিতে সে অত সুদর্শন না, কিন্তু তার চেহারা আল্লাহ পছন্দ করেন। সে তো ইউসুফ আলাইহিস সালামের অনুসারী। কোনোদিন মসজিদের পাশ দিয়ে গেলে বোঝা যেত, সে যেন মসজিদের একটি স্তম্ভ।

তার হৃদয়কে সে রেখে আসে মসজিদের আঙিনায়। সেখানেই পাঁচবার ফিরে ফিরে আসে। যাতে সে অনুভব করতে পারে, সে বেঁচে আছে। তার হৃৎস্পন্দন যেন তাসবিহ পাঠ করে চলেছে আল্লাহর স্মরণে। স্ত্রী তার অন্তরে প্রশান্তি দেবে, যাতে সে মসজিদের পানে অব্যাহত ছুটে চলতে পারে। সালাতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানসিক তৃপ্তি অর্জন করে নিতে পারে।

ছেলেটা সুদর্শন হতে পারে কিন্তু পাপের কারণে সে কুৎসিত হয়ে গেছে। মেয়েদের জানা উচিত, কীভাবে পুরুষদের মূল্যায়ন করব। এমন এক জামানা চলছে যখন আমাদের মূল্যবোধ ঘোলাটে। আমাদের স্বপ্নের রাজকুমার যাতে বাস্তবে পরিণত হয় কোনো এক নেককার স্বামীর মাঝে, সে দেখতে যেমনই হোক না কেন।

বিয়ে হয়ে গেছে একটা চুক্তির মতো। নিজেদের পবিত্র রাখতে চাওয়া যুবকদের চাবুকাঘাত করার মাধ্যম যেন এই বিয়ে। কখনো মোহরানা বৃদ্ধি করে, কখনো এমন জায়গায় বিয়ের আয়োজন করে যার আশেপাশে মদের বার পর্যন্ত আছে। আমরা ঘৃণা করি সেই সব হোটেল বা কনভেনশন হল। এগুলো আল্লাহর অবাধ্যতা করার জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি জানি না, সেখানে যাওয়ার জন্য এত হুড়োহুড়ি কেন।

কখনো এত এত জিনিস চাওয়া হয় যে, এই কর্মচারী (বর) যদি নিজের মালিকানায় থাকা সবকিছু বেচেও দেয়, এমনকি নিজের জামাকাপড়ও, তবু যেন সেই মহামূল্যবান বস্তু (কনে)-কে কিনতে পারবে না।

দুঃখজনকভাবে কেউ কেউ মনে করে, স্বামীর হৃদয়ে স্ত্রীর অবস্থান ততটুকু ওপরে থাকবে যতটুকু কষ্ট হবে তাকে পেতে। আর বিয়ে সহজে হলে বা মোহর কম হলে সেই স্বামী বুঝি তাকে কম দামি মনে করবে! একটা মেয়ের দাম কত? কত টাকা মূল্যে সে 'নেককার স্ত্রী' উপাধি লাভ করতে চায়? আর একটা ছেলের? কত টাকা দিয়ে সে একজন 'নেককার স্ত্রী' কিনতে চায়?

বিয়ের অর্থ অনেক গভীর। আজীবন ছুটে চলার সংগ্রাম। পথ দীর্ঘ হতে পারে। বিয়ে মানে জমকালো পোশাক আর গহনা নয়। স্বপ্নের রাজকুমারকে নিয়ে আকাশ-কুসুম কল্পনা নয়। এটা একটা বন্ধন। একটা যাত্রা। এখানে মিল থাকতে হবে। যাতে আল্লাহর তাওফিক আসে। এখানে দায়িত্ব পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। পারস্পরিক বোঝাপড়াটাই আসল। যে যত ধৈর্য ধরতে পারবে, তার অবস্থান তত ওপরে। সে অপর পক্ষকে ততই ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখতে পারবে।

এটা অনেকটা ছোটবেলার ওই খেলার মতো—যেখানে দুজন হাত ধরাধরি করে ঘুরতে থাকে। এ খেলায় ভারসাম্য হারানোর ভয় আছে। প্রায় পড়ো-পড়ো অবস্থায় অন্যজন শক্ত করে না ধরলে টিকে থাকা মুশকিল। এই খেলা তো আমরা নির্ভরযোগ্য বন্ধুর সাথেই খেলতাম, যাতে হুট করে ছিটকে না যাই।

যা-ই হোক, সে তো একটা খেলা মাত্র। বিয়ে তো কোনো খেলা নয়। এটা বাস্তবতা। জীবনের অনেক কিছু কেনা যায় না। যে সব কিনতে অনেক টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয়, সেগুলো ছেড়ে দেওয়াতেই মুক্তি।

পুনশ্চ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যদি তোমাদের কাছে এমন কেউ আসে যার দ্বীনদারি ও চরিত্র নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তার কাছে বিবাহ দাও। যদি তা না করো তাহলে দুনিয়ার বুকে বড় ধরনের ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি হবে।'[১]

হাদিসটি ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ-সহ আরও অনেকে বর্ণনা করেন।

[১] *জামি তিরমিযি* : ১০৮৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৯৬৭, হাদীসটি সহিহ

গোলাপের পাপড়িগুলো

আজ আমি জীবন-গোলাপের পাপড়িগুলো ছড়িয়ে দেবো শব্দে শব্দে। হয়তো সেই স্মৃতিচারণের জন্য। অথবা এ জন্য যে, তোমাদের জীবনেও এমন দিন আসবে।

আমি তখন নীল ফ্রকের ওপর সাদা ওড়না পরতাম। ছিলাম স্কুল-ছাত্রী। নতুন বছরের শুরুর অপেক্ষায় তখন। নতুন বইয়ের সুগন্ধ। খাতাগুলোতে রঙিন মলাট। নতুন কালো জুতো। আগ্রহভরে কেনা নতুন কলম। কখনো ভুলব না সেই পদক্ষেপ। ঠক ঠক ঠক। প্রিয় শিক্ষিকা মিনার আগমন। যাকে আমরা মিনা ম্যাডাম বলে ডাকতাম।

তিনি আমাদের আরবি ভাষা শেখাতেন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে দিতেন কিছু নসিহত। আমি কখনো ভুলব না তার সবুজ জামা। সেই জামায় তাকে কী যে সুন্দরী লাগত! সেটা মনে হয় তিনিও জানতেন। তাই সবকিছু পরার সময় তিনি খুব যত্ন নিতেন। এমনকি সুগন্ধিও মাখতেন কড়াভাবে। যখন তিনি কোনো অধ্যায় পড়াতে গিয়ে দুই সারির মাঝে হাঁটতেন অথবা আমার কাছে এসে প্রশ্ন করতেন, তখন আতরের সুবাস নাকে লাগত। ভালো লাগত খুবই।

আমরা তাকে যথেষ্ট সম্মান করতাম। তাই বুঝি তাকে সামান্য একটা বিষয় বলতে পারতাম না—তিনি নিজেই নিজের দেওয়া উপদেশগুলো মানেন না! তিনি আমাদের নিষেধ করেন টাইট-ফিটিং জামা পরতে কিংবা মেক-আপ করতে। তিনি বলতেন, এসব হারাম, জায়েয নেই। অথচ তিনিই আবার আতর মেখে টাইট জামা পরে শরীরের সৌন্দর্য প্রকাশ করে আমাদের কাছে আসতেন।

অবশেষে একটি দিন এলো। এ দিনের কথা হয়তো তার সারা জীবন মনে থাকবে। তিনি একজন ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমার ব্যাপারে তোমার মূল্যায়ন কী?'

অপেক্ষা করছিলেন প্রশংসার জন্য। মেয়েটা বেশ সাহসের সাথে বলে দিল, 'আপনি আমাদের যেসব উপদেশ দেন, সেগুলো নিজেই মানেন না।'

কিছু মেয়ের আঁতকে ওঠা, কারও বিস্ময়ের দৃষ্টি, কারও ফিসফিসানি, আবার কারও হাসি চেপে রাখা—এর মাঝে কিছু সময় কেটে গেল। ঘণ্টা পড়ে শেষ হয়ে গেল পিরিয়ডটা।

কয়েকদিন পর। চমক অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। বার্তা পৌঁছে গেছে। ম্যাডামের কাছ থেকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটা পেয়ে গেছি। তিনি মোটেও রেগে যাননি। মেয়েটাকে ধমক দেননি। আমাদের থেকে শিখতে তার অহমিকায় এতটুকু বাধেনি। তিনি আমাদের সামনে হাজির হলেন এক ভিন্ন অবয়বে!

লম্বা ঢিলেঢালা বোরকা পরে এলেন তিনি। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মেক-আপ বা আতর সবকিছুকে যেন বিদায় জানিয়েছেন। কেউ যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাই কয়েক দিন যেতেই এক দ্বীনদার যুবক তার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ল। তাকে প্রস্তাব দিলো। আমরা খুশি হলাম সবাই।

সেদিনের কথা ভুলব না কখনো। ক্ষমা করবেন ম্যাডাম, আপনার দেওয়া শিক্ষা এখনো শেষ হয়নি, তার ব্যাখ্যা চলছে।

সুখের বাজার

নিজেকে প্রশ্ন করি, সুখ কী? এর স্বাদই-বা কেমন? আমি কি সেই সুখের কাছে পৌঁছে গিয়েছি? কোথায় তা খুঁজছি? কয় কেজি দরে সুখ কেনা যায়? কোন বাজার থেকে? কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় বেশ কিছু মুখচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সবার মুখে মুচকি হাসি।

একটা শিশুর কাছে চূড়ান্ত সুখ হলো তার প্রিয় চকলেটখানা। একজন বৃদ্ধা চূড়ান্ত সুখ পায় যখন কেউ তার রান্না খেয়ে প্রশংসা করে। ষোলো বছর বয়সের একটা মেয়ের কাছে চূড়ান্ত সুখ কী? সুন্দর একটা জামা পরে বান্ধবীদের দেখানো। দশ বছর বয়সি একটা কিশোরের কাছে চূড়ান্ত সুখ হলো প্রিয় ফুটবল দলের ম্যাচ জেতা। একজন বাবার চূড়ান্ত সুখ তার ছেলের ভালো রেজাল্টে, অথবা যে-কোনো সাফল্যে। একজন ভালো মা চূড়ান্ত সুখ পায় তখনই, যখন কোনো সুদর্শন দ্বীনদার যুবক তার মেয়ের পাণিপ্রার্থী হয়। পৃথিবীর বুকে প্রতিটা মেয়ের চূড়ান্ত সুখ বধূবেশে নিজেকে দেখার মাঝে। একজন নববধূর কাছে চূড়ান্ত সুখ হলো বিয়ের প্রথম কয়েক মাসের মাথায় নতুন সন্তানের সুসংবাদ পাওয়া। একজন উচ্চাশার অধিকারী যুবকের চূড়ান্ত সুখ কর্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে।

কিন্তু জীবনের প্রান্তে, কোনো এক জায়গায়...

একজন দরিদ্র যুবকের চূড়ান্ত সুখ হলো রাত কাটানোর ঠাঁই খুঁজে পাওয়া। কারণ, তার তো কোনো বাড়ি নেই। যে মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে, তার কাছে

চূড়ান্ত সুখ হলো গৃহকর্ত্রীর ছেলের প্যান্টটা পুরাতন হয়ে যাওয়া। কারণ, সেটা তার ভাগ্যে জুটবে, সে নিজের ছেলেকে পরতে দেবে। কোনো হোটেলের কর্মচারী বা ওয়েটারের জন্য চূড়ান্ত সুখ বখশিশ পাওয়াতে। তা দিয়ে সে হয়তো এক কেজি গোশত কিনে খাওয়াতে পারবে সন্তানদের। রাস্তার ছেলেদের চূড়ান্ত সুখ হয়তো মিষ্টির দোকানদারের সাধা এক টুকরো মিষ্টিতে; যে টুকরোর দিকে সে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে ছিল। দামি মিষ্টির দোকানের গ্লাসে নাক ঠেকিয়ে। একজন সাধারণ যুবতীর চূড়ান্ত সুখ জীবনসঙ্গী হিসেবে এমন একজনকে পাওয়া—যিনি তার দেখভাল করবেন, যার হৃদয় আঙিনায় যুবতীর আশ্রয় হবে। এর বদলে চাকরি-বাকরি করে জীবন কাটানো তার আরাধ্য হতে পারে না। একজন রোগীর জন্য চূড়ান্ত সুখ হলো রিপোর্ট বা এক্স-রের দিকে তাকিয়ে যখন ডাক্তার মুচকি হেসে বলেন, 'ভয় নেই'। বড় কোনো রোগের আশঙ্কা থেকে মুক্ত সে।

আসলে আমরা অনেক নিআমতের মাঝে থাকি। যতক্ষণ না আমরা তা হারাচ্ছি ততক্ষণ তার মর্ম বুঝি না। আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনার প্রতি—সেই সব নিআমতের জন্য যেগুলোর মাঝে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি অথচ আমরা সেগুলোর মর্ম জানি না! এরপরও সুখী হওয়া খুব কি কঠিন? দুনিয়ার দুর্ভাবনা ছেড়ে দিই বরং। যা আছে, যা-কিছু সামর্থ্যে কুলায় তা-ই নিয়ে সুখী হয়ে যাই। আর আল্লাহর কাছে বলি, 'হে আমার রব! আমাকে সন্তুষ্ট থাকার মানসিকতা দিন।'

সুখ তো আছেই। সুখের বাজারে সব বিনামূল্যে পাওয়া যায়। কেবল আমরা রাস্তাটা চিনি না।

অনেকে আছে

অনেকে আছে খুব একটা কথা বলে না, তবে বললে এমন মিষ্টি কথা বলে যা ভোলা যায় না। অনেকে বেশি কথা বলে, কিন্তু তার কথাবার্তা সব অর্থহীন। সবাই ভুলে যায়। অনেকে খুব বেশি প্রকাশ করে না নিজেকে। তবে সে যেন সর্বদা উপস্থিত। তাকে অনুভব করা যায়। অনেকে প্রতিদিনই আসে। কিন্তু তার দিকে বারবার ফিরে চাওয়া হলেও তাকে মনে থাকে না। অনেকে সামান্য কাজই করে। কিন্তু তার অবদান ভোলবার নয়। অনেকে অনেক কাজ করে, লোকজনকে জানিয়ে করে। তবুও মনে থাকে না। অনেকে তেমন ভুল করে না। কিন্তু যে কয়টা ভুল করে সেগুলো ব্যথা দেয়। সে ব্যথা কখনো ভোলা যায় না। অনেকে অনেক ভুল করে। তবু আমরা তাকে ক্ষমা করে দিই, তার অবদানের কথা ভেবে।

এদের কাজ অল্প হলেও তা আমাদের অন্তরে জায়গা করে নেয়। এমন এক জায়গা করে নেয় যা ভোলবার নয়। এভাবেই দিনের পরিক্রমায় পরিচিত অনেককে আমরা ভুলে যাই। আমাদের অগোচরে অনেকে চলে যায়। অনেকে পালিয়ে যায় আমাদের রেখে। কাউকে আমরা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি। অনেকে আছে যাদের প্রশংসা করলে আমাদের কাছে আসে, আবার তাদের উপদেশ দিলে দূরে সরে যায়।

অনেকে আছে যাদের সাথে মতের মিল হলে আমাদের পছন্দ করে, আবার মতের বিপক্ষে গেলে অপছন্দ করে ফেলে। আমরা ভুল করে অনেককে দরকারের থেকে বেশি কাছে টেনে নিই। ফলে সে সম্মান দিতে ভুলে যায়। লাল দাগ অতিক্রম করে ফেলে। ফলে তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। আমরা ভুল করে অনেক মানী ব্যক্তিকে

সম্মান দিই না, ফলে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারাই। অনেকে বয়সের ব্যবধান ভুলে নিজেকে বেশি জ্ঞানী মনে করে, তাকে সবাই বর্জন করে। অনেকের ক্ষেত্রে সম্মানবশত আমরাই বয়সের ব্যবধান মুছে দিই, ফলে সে সফল হয়। অনেকে আমাদের ভালোবাসে, তাই দেখে আমরাও তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করি। অনেকে মারা যায়। আমাদের হৃদয়ে রেখে যায় একটি ক্ষতস্থান, একটি শূন্যস্থান। সে স্থানটা তার জন্য দুআ করে চলে। অনেকে আমাদের মাঝেই বসবাস করে। আমরা তাদের হয়তো ভালো মানুষ ঠাওরে বসি। কিন্তু তার ভেতরটা শূন্য। ভালোমতো তাকালে তার কোনো আকৃতি চোখে পড়ে না।

আবার অনেকে আমাদের হৃদয়ের আঙিনায় অতি সন্তর্পণে জায়গা করে নেয়। অজান্তেই আমরা তাদের খোঁজ করতে শুরু করি। তারা আনন্দিত হলে আমরা আনন্দ পাই। তারা কষ্টে পড়লে আমরাও কষ্ট পাই। তারা অনুপস্থিত থাকলে আমরা তাদের সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষী হই। তাদের প্রয়োজনে আমরা দুআ করি।

সবচেয়ে ভালো হলো সবার থেকে দূরে থাকা। হ্যাঁ, সবচাইতে ভালো উপায় হলো সবাইকে রেখে উড়ে চলা। হয়তো আমরা একই আরশের ছায়ায় একবার মিলিত হব। সময়ের পরিক্রমায় তারা যদি হারিয়েও যায়, তবু আল্লাহর জন্য তাদের ভালোবেসে যাব।

আল্লাহ! যে আমাকে আপনার জন্য ভালোবাসে, তার প্রতি আমার হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন।

স্থগিত স্বপ্ন

প্রত্যেকটা মেয়ের মনে স্বপ্ন থাকে। নানান রকম স্বপ্ন। ব্যক্তিত্বের ভিন্নতায় স্বপ্নগুলোও ভিন্ন হয়। কিন্তু একটা স্বপ্ন একদম এক। আর তা হলো—বিয়ে। কখনো হয়তো এটাই একমাত্র স্বপ্ন—যা পূরণে দেরি হলে অস্থিরতায় ছেয়ে যায় জীবন। আবার কখনো সে এতটাই সূক্ষ্মভাবে স্বপ্ন সাজায়, তার কাছে মনেই হয় না, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের জীবনের অবস্থাগুলো সমাজভেদে ভিন্ন। আবার স্তরের বিভিন্নতাও বিয়ের বয়স নির্ধারণে বড় একটা ভূমিকা রাখে। কিছু সমাজে মেয়েদের দ্রুত বিয়ে হয়। সেখানে বিশের ওপরে গেলেই ভাবা হয় বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে।

আবার কিছু সমাজে—বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে মেয়ের বা তার পরিবারের সিদ্ধান্ত থাকে পড়ালেখার পর বিয়ে হবে। সেক্ষেত্রে ত্রিশে গেলে বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে বলে ধরা হয়। তখন যে-কোনো মানুষ বিয়ের প্রস্তাব দিলেই তাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। স্বপ্ন কেড়ে নেওয়া হয় তার। মাথার মুকুট ভেঙে দেওয়া হয়, ছিটকে পড়ে মুক্তোদানা। তার ঠোঁটের কোণে হাসি মিলিয়ে যায়। দপ করে নিভে যায় চোখের জ্যোতি। যারা জোর-জবরদস্তি করে, তারা মেয়েটার মনোজগতের খবর রাখে না।

তারা জানে না, তার নিজস্ব মত আছে। সে হয়তো প্রথম থেকে 'বিয়ে'কে-ই নিজের একমাত্র স্বপ্ন নির্ধারণ করেনি। সে মুলতবি করে রেখেছিল এ স্বপ্নটা। তার অন্যান্য স্বপ্নের মতো এটাও ছিল একটা স্বপ্ন।

রিযিক আসে যথাসময়ে, আল্লাহর আদেশে। একজন নেককার স্বামী মেয়েটার চোখ শীতল করবে। সুতরাং, দেরি না করে উপায় গ্রহণ করাই বুদ্ধিমতীর কাজ। কখনো হয়তো দেরি হচ্ছে মেয়েটার কারণেই। একজন দ্বীনদার চরিত্রবান যুবককে সে ফিরিয়ে দিচ্ছে স্বপ্নের রাজকুমার না হবার কারণে। কখনো আবার তার চিন্তায় পরিপক্কতা আসেনি, সে বুঝতেই পারেনি বিয়ের উপযুক্ত সে। এমন অনেক মেয়েকে দেখেছি যারা কেবল বয়সেই বেড়েছে; আচার-ব্যবহারে বেড়ে ওঠেনি। তাদের ভদ্রতাবোধ বয়সের তুলনায় বড্ড বেমানান।

শান্ত মনোভাব, ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা, পর্দা করা—এগুলো মেয়েদের অস্ত্র। আল্লাহর তরফ থেকে নেককার স্বামী পাওয়ার অস্ত্র। তাকে উপযুক্ত হতেই হবে। সে যে একজন রাজকুমারী!

কখনো আবার মেয়ের পরিবার বিয়েতে দেরি হবার কারণ। তারা অনেক কিছু চায়, দাবি করে। কেন জানি মামা-চাচারা এমন অনেক বিষয়ে নাক গলাতে আসে যেখানে তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। কেন মেয়েরা চাচাতো বোন বা বান্ধবীর কথায় কান দিয়ে একটা সহজ সম্ভাব্য বিয়েকে নস্যাৎ করে দেয়? কেন তারা আল্লাহর বাণী পড়ে দেখে না?

‘তারা যদি দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের ধনী করে দেবেন।’[১]

‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কিছু দেন না।’[২]

‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব দেন না। নিশ্চয় কষ্টের পর আল্লাহ সুখ দেবেন।’[৩]

কখনো যেন নিজের সৌন্দর্যকে কারণ হিসেবে দেখানো না হয়। মেয়েটা সুন্দরী, কারণ, আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তিভেদে সৌন্দর্য ভিন্ন হয়। যা অন্যের চোখে ভালো লাগে তা আমার ভালো লাগবে না। আবার আমার যা ভালো লাগে তা অন্যের বিন্দুমাত্র পছন্দ নাও হতে পারে। আমরা দুজন একটা মেয়েকে সুন্দরী বললাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো মেয়ে এসে তাকে কুৎসিত বলে দেবে। এর বিপরীতটাও হতে পারে।

---

[১] সূরা নূর, আয়াত : ৩২

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬

[৩] সূরা তালাক, আয়াত : ৭

আর সৌন্দর্যটা ভেতরের জিনিস। এটা মানুষের মন থেকে উৎসারিত। আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা ও তৃপ্তি অনুভব করা ভেতরে অনাবিল সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। তাই হৃদয়-মন খুলে নিজের ভেতরটা দেখাই সমীচীন।

সৌন্দর্য একটি সুন্দর বৃক্ষের মতো। একে পানি দিয়ে পরিচর্যা করতে হয় অবিরত। সব মেয়েই সুন্দরী। সত্যিই সুন্দরী। নিজের ওপর বিশ্বাস আনলে মানসিকতায় পরিবর্তন আসে, লোকে তার ওপর ভরসা করতে শুরু করে। তখন মানুষজন চেহারার সাথে ভেতরের সৌন্দর্যটাও দেখে। তাই সতর্ক থাকাই কাম্য। কারণ, চেহারার দিকে সবাই তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ, সবকটা মানুষই। কারণ, মেয়েটা ইসলামের একটি চলন্ত মিম্বর। তাই তাকে সতর্ক থাকতে হবে। মা-বোন-খালা-ফুফু সবসময় নিজের আত্মীয়ের জন্য একটা মেয়ের কথা মনে মনে ভাবে। নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। নিজেকে গুছিয়ে আনতে হবে। বাহ্যিকতা ঠিক রাখতে হবে। সাজিয়ে আনতে হবে জীবনটাকে। নিজের কর্তব্যগুলোকে সুবিন্যস্ত করতে হবে।

উদাসীনতা থেকে সাবধান! কে এমন মেয়ে পছন্দ করবে যার হাত অপরিষ্কার? কে এমন মেয়ের কাছে যাবে যার গা থেকে দুর্গন্ধ আসে? যেই মেয়ের জামাকাপড় অগোছালো তার সাথে কে মিশতে চাইবে? যে মেয়ে সবসময় মুখ বাঁকা করে রাখে, তাকে কে সালাম দেবে? আমি বলছি না, সারাক্ষণ সাজগোজ করে থাকা চাই। নরম গলায় কথা বলা চাই। সুগন্ধি মেখে মহিলাদের কাছে যেতে হবে। রংচঙে পোশাক পরতে হবে। না, বরং বলছি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হাসিখুশি হয়ে যেতে হবে। আর বাহ্যিক সৌন্দর্যের আগে গুরুত্ব দেওয়া হোক ভেতরের সৌন্দর্য। সবাই হিংসুককে অপছন্দ করে। যার কথাবার্তা আক্রমণাত্মক, তাকে সবাই পরিহার করে। ঝগড়া থেকে বেঁচে থাকার সময় মনে রাখতে হবে, এ কাজ কেবল আল্লাহরই জন্য।

‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য তিনি নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দেন যা সে ভাবেওনি।’[১]

অবশেষে বলছি—বিয়ে মানেই শেষ নয়, বরং শুরু। বিয়ে একটি দায়িত্ব, একটি অংশীদারিত্ব। যেখানে স্ত্রী তার স্বামীকে গ্রহণ করে, আর স্বামী তার স্ত্রীকে। বিয়ে একপ্রকার আনুগত্য। তাই এর পরে যা আসে তা আনুগত্যই হবে। বিয়েকে একমুখী

---

[১] সূরা তালাক, আয়াত : ২-৩

লক্ষ্য মনে না করে তা যে বহুমুখী লক্ষ্য তা মাথায় রাখতে হবে। যাতে একজন মেয়ে তার স্বামীর সাথে গড়ে তুলতে পারে একটি ইসলামি দ্বীনি পরিবার। ভাবার কোনো কারণ নেই, বিয়ে একটি রঙিন স্বপ্নে ভরপুর সিন্দুক। আমি বলছি না তা রংচঙে না। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি স্তরের সৌন্দর্য ভিন্ন, প্রতিটি পদক্ষেপে সফলতা-ব্যর্থতার হিসেব আসতে পারে।

একজন নেককার স্বামী পেতে হলে সিজদায় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে, যা মেয়েটাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে। যদি দেরি হয়, তবে মনে রাখতে হবে, এটা একটা পরীক্ষা। হয়তো আল্লাহ অন্য কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। হয়তো আল্লাহ অন্য কোনো কাজে তাঁর বান্দিকে ব্যস্ত রাখতে চাইছেন। হতেই পারে, এখন বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েটার মা একা হয়ে যাবেন। তার কষ্ট হবে; এখন তার সেবা করে হয়তো মেয়েটাকে জান্নাতের পথে এগিয়ে রাখতে চান তার রব। কুরআন পড়া, মুখস্থ করা, সুর করে পড়া বা অন্য কাউকে মুখস্থ করানোর জন্য হয়তো আল্লাহ তাকে অতিরিক্ত সময় দিচ্ছেন। হয়তো তাকে এমন একটা কাজে ব্যস্ত রাখছেন, যাতে অভিনব কোনো ফল আসবে এবং ইসলামের উপকার হবে। ইয়াতিম-দরিদ্র শিশুদের সাহায্য করা বা অসুস্থদের দেখার একটা কাজে হয়তো সে ব্যস্ত, যেটা বিয়ের পর করা হতো না আর।

কত মেয়ে আছে যাদের দেরিতে বিয়ে হয়েছে, এমনকি চুলে সাদা রং এসে গেছে, তবু তারা বিনা কষ্টে নেককার স্বামী পেয়ে গেছে। আবার কত মেয়ে আছে যারা তাদের স্বপ্নের সুন্দর রাজকুমারকে বিয়ে করেছে, সবচেয়ে সুন্দর জামা আর গয়নাগাটি পরেছে; শেষ পর্যন্ত তাকে তালাক বরণ করে নিতে হয়েছে! আমাদের সামনে কত মেয়ে আছে যাদের আমরা বিবাহিত দেখে আনন্দিত মনে করছি। কিন্তু আসলে সে হয়তো কষ্টে আছে, আর প্রতিনিয়ত কামনা করছে বিয়ের আগের একাকী জীবন।

একটা কথাই বলতে চাই—'আল্লাহর সূক্ষ্ম অনুগ্রহ ও করুণা'। হয়তো দেরিতে বিয়ে হওয়াটাই মেয়েটার জন্য নিআমত, অথচ সে বুঝতেই পারছে না। গায়েবের খবর জানলে আমরা বাস্তবতাকে মেনে নিতাম। তাই আল্লাহ আমাদের জন্য যা ফয়সালা করেছেন তাতে সন্তুষ্ট হই। বিরক্তি প্রকাশ না করি। ধৈর্য ধরতে শিখি। এ দুনিয়া আর কদিনের! জান্নাত তো বাকিই আছে। আল্লাহর কাছে চাই—তিনি যেন আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সুখী করেন।

তুমি কত সুন্দর

খুবই ব্যথিত হই যখন জানতে পারি—কেউ কেউ তার বাহ্যিক অবয়বে বিরক্ত, হতাশ। হয়তো সে লোকচক্ষু এড়িয়ে চলে, কারও সাথে মেশে না, মানুষজন থেকে দূরে সরে যায়। কারণ, তার মনে ভীষণ কষ্ট। নিজেকে নিয়ে।

থামো ভাই! থামো বোন! এই যে তুমি সুস্থ-সবল আছ, পরিপূর্ণ গড়নে নিজ পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারছ, হাত ব্যবহার করতে পারছ, দু-চোখে দেখতে পাচ্ছ, কানে শুনতে পাচ্ছ—এতে কি তুমি খুশি নও?

তোমার কি মনে হয়, মানুষজন দুনিয়ার সবকিছু বাদ দিয়ে তোমার নাকের দিকেই তাকিয়ে আছে? তোমার কি মনে হয়, সবাই তোমার গায়ের রং দেখে, তোমার জিহ্বা কী বলে সেটা শোনে না? তুমি কি মনে করো, সাদা রং ভিন্ন বলেই সুন্দর? তুমি কি মনে করো, সুন্দরীরাই কেবল সুখী?

না, আল্লাহর কসম! আমরা প্রতিদিন এমন অনেক নুরানি চেহারার মানুষ দেখি যারা হয়তো ছোটখাটো বা কালো রঙের, তবুও তাদের আমরা অনেক পছন্দ করি। কিছু মানুষের সফলতা আমাদের বিস্মিত করে, যদিও তার মাঝে ততটা সৌন্দর্য নেই।

যখন কোনো ছেলে এমন কোনো মেয়েকে বিয়ে করে, যে তার থেকে কম সুন্দরী তখন মহিলাদের আফসোসের অন্ত থাকে না। প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করলে তারা হয়তো বুঝতে পারত, স্বামী এ মেয়ের ভেতরের সৌন্দর্যেই আগ্রহী হয়েছে। বাহ্যিকতার আগে হয়তো-বা ভেতরের সৌন্দর্যই তাকে প্রভাবিত করেছে। কেবল

'সুন্দর চেহারা' যেমন সবাই খোঁজে তেমনটা সে খোঁজেনি।

আসলে যারা যৌবনের প্রারম্ভে তাদের মাঝে এ ধরনের চিন্তা আসে। কারণ, তারা নিজেদের ভেতরটা অনুসন্ধান করে দেখে না। তারা কেবল আয়নায় নিজেদের চেহারাটা দেখে। তাদের এমন একজন দরকার, যে তাদের ভেতরটা গড়ে তোলার ব্যাপারে উপদেশ দেবে।

আমাদের দরকার জানা, বোঝা, কথাবার্তা বলা, তথ্য সংগ্রহ করা এবং লোকজনের সাথে কী রকম ব্যবহার করতে হবে তা আয়ত্তে আনা। এগুলোকে আমি 'এটিকেটস' বলব না, 'উত্তম গুণাবলি' বলব।

সুখ পেতে সৌন্দর্য বা পরিপাটি থাকাই যথেষ্ট নয়। কেননা সৌন্দর্যের সাথে অজ্ঞতা যুক্ত হলে তা কুৎসিত হয়ে যায়। আবার পাপাচার সম্পৃক্ত হলে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। তুমি যদি লাল-সাদা-হলুদ নানা রঙের চকলেট দেখে বেশ সুস্বাদু মনে করো, আর মুখে দেওয়ার পরে দেখো যে তা আসলে লবণ, বালু ও রং দিয়ে তৈরি নকল চকলেট তাহলে কেমন লাগবে?

মানুষকে কেবল বাহ্যিক আকৃতি দিয়ে বিচার করা যায় না। একজন মানুষ তৈরি হয় মূল্যবোধ, শিক্ষা, নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও আচরণ দিয়ে। আর এ সবকিছুর মূলে রয়েছে প্রকাশ্যে বা গোপনে আল্লাহভীতির উপস্থিতি।

প্রিয়জনেরা! দ্বীনদারিতা, ঈমান ও হৃদয়ের বিনম্রতাই বিচার্য। এ সবগুলোর সমন্বয় প্রকাশ পায় একটি পবিত্র চেহারায়। তোমরা নিশ্চিত থাকো, সুন্দরী কোনো মেয়ে বা সুদর্শন ছেলে যারা কিনা সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তাদের চেহারায় এমন পবিত্রতার প্রকাশ পাবে না। কত সুন্দর চেহারা আছে যেগুলো গুনাহর কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। রং দিয়েও ঢাকা যায় না সেই মলিনতা, সেই খারাপ চরিত্রের আভাস।

লিপস্টিক কখনো এমন কোনো ঠোঁটকে রাঙাবে না, যে ঠোঁট কেবল মিথ্যে বলে চলে। গালে লাল রং লাগালে তা কখনো লজ্জায় লাল হওয়া গালের সাথে মিলবে না। চোখের নিচে সুরমা মাখলে কখনো সেই চোখ থেকে সুন্দর হবে না, যে চোখ অবনত থাকে। সবচেয়ে দামি সুগন্ধি কখনো সেই মেয়ের চরিত্র থেকে উত্তম নয়, যে আল্লাহভীরু। তারা মনে করে, সুন্দর বা লেটেস্ট মডেলের জামা পরা বা সবচেয়ে নতুন ব্রান্ডের নাম জানাই বুঝি আধুনিকতা।

মেয়েদের চোখের পাতায় যে সাজ তা লজ্জাকে শেষ করে দেয়। তখন রহমতের দৃষ্টি সংকুচিত হয়ে আসে। গলায় লাল রং মেখে অহমিকা প্রকাশ করাটা অনেকে সাহসিকতা মনে করে, অদ্ভুত না ব্যাপারটা? যে মেয়েটা রং মেখে শরীরের সমস্ত সৌন্দর্য প্রকাশ করে, সে এখন আধুনিক সভ্য সমাজের ভদ্রমহিলা। আর যে পবিত্র মেয়েটা নিজেকে ঢেকে রাখে, সে হয়ে গেছে সেকেলে ও অসভ্য। এমনকি যদি সেই মেয়েটা সুন্দর যুক্তি দিয়ে কথা বলে, তবুও তারা তার চেহারা খোঁজে। দেখে সেখানে লিপস্টিক আছে কি না!

প্রিয় বোন! নিজেকে কষ্ট দিয়ো না। দুনিয়ার সমস্ত মেক-আপ এমন মুখকে সুন্দর করতে পারবে না যার নুর নিভে গেছে পাপাচারে। এসো, নিজের ভেতরে সৌন্দর্যের খোঁজ করো। আর ছেলে তোমাকেও বলি, তুমিও নিজের ভেতরের সৌন্দর্যটা খুঁজে বের করো। বুকের মাঝে ঈমানের আলো জ্বেলে দাও। যেখানেই যাও, আল্লাহর ভালোবাসা বুকে লালন করো। দৃপ্তকণ্ঠে বলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আল্লাহকে বলো, 'রব! আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার কাছে টেনে নিন। আমার প্রতি সন্তোষের দৃষ্টিতে তাকান।'

শুরু করো। দেখেছ কি? তোমার ভেতরে সৌন্দর্য নড়ে-চড়ে বসেছে। অন্তরের সুখ অনুভব করছ তুমি। কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিতেই তোমার জীবন সুখী হবে। প্রতিটি শ্বাসে তাওহিদের বাতাস গ্রহণ করো। বুক ভরে নাও কুরআনের সুবাস। দেখলে তো তুমি কী রকম পরিপাটি ও সুন্দর হয়ে গেছো! হ্যাঁ, তুমি সুন্দর, তুমিও সুন্দরী। কারণ, তোমরা দুজনেই আল্লাহকে ভালোবাসো।

আল্লাহ! আপনাকে ভালোবাসা যেন আমাদের প্রিয় কাজ হয়ে যায়। আপনাকে ভয় করা যেন আমাদের সবচেয়ে প্রগাঢ় অনুভূতি হয়। আর আমাদেরও ভালোবাসুন, হে রব!

সমুদ্র, তোমায় ধন্যবাদ!

কখনো ভালোবাসার মানুষটিকে খুব বেশিই ভালোবাসতে মন চায়। ইচ্ছে করে তাকে বেঁধে রাখি অনুভূতির শেকলে। পেরেক দিয়ে এঁটে রাখি, যেন চাইলেও দূরে সরে যেতে না পারে। হয়তো তাকে বাধ্য করি আমার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে। সে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

ভালোবাসাগুলো আঘাত হয়ে আসে। কখনো আঘাত হয়ে আসে বাগ্‌দত্তা নববধূর প্রতি নতুন স্বামীর অনুভূতি। কখনো ছেলে, যে তার বাবা-মার কাছে এমন কিছু চাইছে যা তাদের সাধ্যাতীত। কেন আমরা অন্যকে আঘাত করি ভালোবাসার নামে? কেনই-বা লোকজন আঘাত করে আমাদের?

প্রতিটা কষ্টদায়ক কথা বলার আগে যদি আমরা মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখতাম, তাহলে এতটা কষ্টের কারণ আমরা হতাম না। কিছুক্ষণ দেরি করলে আমরা যা হারিয়েছি তা হারাতাম না। যদি আমরা অন্যদের ভালোবাসতাম, তাহলে তাদের কখনো কষ্ট দিতাম না। কারণ, তখন মানসিক তৃপ্তিলাভই যথেষ্ট মনে করতাম। কারও অপমানে কষ্ট পেতাম না। এক দারুণ পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টি মনের ভেতরে সুখানুভূতি দিত।

পাশের কাউকে কষ্ট দেওয়ার আগে একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন। আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন—কীভাবে বন্দি না করেও কাউকে ভালোবাসা যায়। অন্যে আমায় ভালোবাসল কি না, কী পেলাম তাকে ভালোবেসে, এসব না ভেবে, কাউকে কতটা ভালোবাসলাম, ক্ষমা করতে পারলাম কি না তা ভেবে দেখাই শ্রেয়!

ভালোবাসলে হতে হবে সূর্যের মতো। যে আমাকে ভালোবাসে, সে কাছে এলে যেন উষ্ণতা আর প্রশান্তি পায়। ভালোবাসলে হতে হবে সমুদ্রের মতো। সুবিশাল আর স্বচ্ছ। কল্যাণ আর চমকে পরিপূর্ণ। সমুদ্র তার বুকে ভারী জাহাজকে ঠাঁই দেয়, আবার ছোট্ট মাছের মতো প্রাণীকেও ধারণ করে নেয়। ছোট-বড় কাউকে আগলে রাখতে তার কষ্ট হয় না। ভালোবাসলে এমনই হওয়া চাই। তখন সমুদ্রের মতো আমার মাঝে লবণাক্ততা যদিও-বা থাকে, তবু সবাই ভালোবাসবে আমায়।

এমনকি আমার ঘ্রাণে, প্রমত্ত ঢেউয়ের আঘাতেও মানব-হৃদয়ে প্রশান্তির উদ্রেক হবে। কারণ, আমার মাঝে 'ধারণ' করবার গুণ আছে। মানুষ আমার দিকে আবর্জনা ছুড়ে দিলেও আমি কোমলভাবে তা তটে ফেলে দেবো। কখনো-বা তাদের প্রতি বদান্য হয়ে ছুড়ে দেবো ফুটন্ত গোলাপ!

একটা ভালো কথা সুন্দর গোলাপের মতো। একটা ভালো কথাও সাদাকা। তবে দান করতে কার্পণ্য কেন? লোকের কাছে যেমনটা প্রত্যাশা করি, ঠিক তেমনটাই হই না কেন! সবাই যেন আমাকে বলতে বাধ্য হয়—

সমুদ্র, তোমায় ধন্যবাদ!

বিয়ে ও রুলার

কেউ কেউ মনে করে এমন কিছু মানুষ থাকবেই—যারা আদর্শ, যাদের কোনো ভুল নেই, যারা শতভাগ দ্বীনদার। তারা কখনো রুলারের টানা দাগ অতিক্রম করবে না।

মেয়েটা এমন একজন ছেলে চায়, যে তার চাইতেও দ্বীনদার। সে তাকে হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবে। কখনো ভুল করবে না। কোনো গুনাহ করবে না। সবসময় চোখ অবনত রাখবে। সারাদিন কুরআন তিলাওয়াত করবে। সারারাত তাহাজ্জুদ পড়বে। আবার কর্মক্ষেত্রেও সফল হবে। অকাতরে ব্যয় করবে তার জন্য।

আবার ছেলেটা তার চেয়েও দ্বীনদার মেয়ে চায়। রাতে বিছানায় ওপাশ ফেরার সময় তাকে দেখবে সালাত আদায় করছে। মেয়েটা কখনো রাগ করবে না। কখনো দুঃখ পাবে না। আবার সুন্দরীদের মাঝে হবে সবচাইতে সুন্দরী। একাধারে হবে কুরআনের হাফিযা, আলিমা। বাচ্চাদেরও খাইয়ে দিতে পারবে। বাচ্চাদের লালন-পালনে এতটুকু কমতি হবে না।

এখানেই থামা দরকার। কেন আমরা আরেকজনের হাত ধরার অপেক্ষায় আছি? কেন নিজেই দায়িত্ব নিচ্ছি না? নিজেই ভালো হয়ে যাচ্ছি না? দ্বীনদারি, ধার্মিকতা ও আল্লাহর নৈকট্য—এগুলো কোনো রুলার দিয়ে মেপে দেখা যায় না। দুনিয়ায় 'একশোতে একশো' কোনো মানুষ নেই।

আমরা তো রোবট নই, যে যন্ত্রের মতো সেটাপ দেওয়া আছে, অনবরত আমল করেই যাব। খুশুর কোনো সুইচ নেই, যে চাপলেই অনুভব করা যায়। ঈমানের

স্বাদ কোনো কৌটায় সংরক্ষণ করা যায় না। চাওয়া-পাওয়ার ছাদকে আসমানে তুলে দিতে নেই। রাজকুমার বা রাজকুমারীর স্বপ্ন দেখতে গিয়ে তাকে অসম্ভব গুণে বিশেষায়িত করা অনুচিত। যার সাথে আমার বন্ধন হবে, সেও ভুল করতে পারে। কখনো তার মাঝে কসুর হতে পারে। দুয়েকবার ফজরের সালাতে দেরি হয়ে যেতেও পারে, এতে ভেঙে পড়লে চলবে না। একটা মেয়ে স্বামীর সেবা, সন্তানদের দেখাশোনা করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে একদিন সকালে কুরআন নাও পড়তে পারে, তাতে আঁতকে ওঠার কিছু নেই!

অনেক মৌলিক বিষয় আছে, সেগুলোতে নজর রাখা দরকার। আমার সামনের মানুষটা একজন মানুষই, ফেরেশতা নয়। আমার স্বপ্নগুলো তার সামনে পেশ করতে হবে, তার মতামত যাচাই করে নিতে হবে। অধিকাংশ মতামত ভালো হলে ছোটখাটো হিসেব-নিকেশ এড়িয়ে যাওয়াই সমীচীন।

বিয়ের সময় খুঁজতে হবে চরিত্রবান সঙ্গী। খেয়াল রাখতে হবে স্বভাবের দিকে। কখনো দ্বীনদারির সাথে খারাপ চরিত্র এসে হাজির হয়। এমন স্ত্রী জুটে, যে দ্বীনি ইলমে পারদর্শী কিন্তু খুব জেদি। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে। স্বামীর সাথে প্রতিটা তর্কে জেতার চেষ্টা করে। তাকে সম্মান করে না। তাই স্বামীও তার সাথে কথা বলতে অপছন্দ করে। অথচ মেয়েটা বুদ্ধিমতী। তার বাড়িই শান্ত থাকে না, সেখানে বাচ্চাকাচ্চা শান্ত থাকবে কী করে!

অন্যদিকে দেখা যায় এমন মেয়েও আছে, যে ফাতিহা আর ছোট্ট কয়েকটি সূরা মুখস্থ জানে। কিন্তু সে তার স্বামীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। স্বামীর প্রশান্তির কারণ সে। স্বামীকে অনুভব করতে দেয় যে, তিনিই তার পরিচালক। ফলে ঘরে প্রশান্তি বিরাজ করে। বাচ্চারাও উত্তমরূপে গড়ে ওঠে। কারণ, তারা একটি শান্ত নীড়ে বড় হয়েছে।

কখনো এমন স্বামী থাকে, যে খুব কর্কশ ও রুক্ষ স্বভাবের। স্ত্রীর মতামতের প্রতি তুচ্ছ মনোভাব পোষণ করে। এমনকি তাকে মারেও। ওদিকে সবার সামনে সে চমৎকার একজন মানুষ, দ্বীনদার, মুসল্লি। বিপরীতে এমন স্বামীও পাওয়া যাবে, যে তেমন একটা জানে না, কিন্তু বেশ দয়ার্দ্র, স্ত্রীর প্রতি ইহসান করে।

রুলার দিয়ে মাপা যায় না। সামনে যে মানুষটা আসবে তাকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হয়। মনে রাখতে হয়, সে আমাদের মতোই একজন মানুষ। আমরা যেমন সবসময় নিখুঁত না, ভুল করি, গুনাহ করি; তেমনি কেউই নিখুঁত না। সবারই ভুল হয়,

সবারই গুনাহ হয়। কাল্পনিক চরিত্র খুঁজে সময় নষ্ট করা অর্থহীন। এদের জন্ম এখনো হয়নি পৃথিবীতে। আবার কেবল বাহ্যিকতা দেখেও ফাঁদে পা দিতে নেই। পরে বাস্তবতা জেনে হোঁচট খেতে হবে, হৃদয় ব্যথিত হবে।

আমরা জানি না, আমাদের মাঝে কে অপরকে ছাড়িয়ে গেছে তার দ্বীনদারি দিয়ে। হতে পারে আমাদের কেউ একটা আয়াত ইখলাসের সাথে পড়ে সবাইকে অতিক্রম করে গেছে। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন প্রত্যেককে এমন একজন উত্তম সঙ্গী দান করেন, যিনি উভয় জগতে চোখজুড়ানোর কারণ হবেন।

ভাবনার শেষ থেকে

কখনো মনে হয় জীবনটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে। আলো সরে গেছে চারদিক থেকে। শূন্যতায় ছেয়ে গেছে চারপাশ। আমরা যে প্রাচীন বাড়িতে বসবাস করি, বৃষ্টির পানিতে খসে গেছে যে বাড়ির পলেস্তারা; সে বাড়িটাও যেন খালি।

আমার হৃদয়ের অনুভূতি যত স্থানে যেতে পারে তার প্রতিটিতে যেন অপরিসীম শূন্যতা বিরাজ করছে। তখন আমরা ধীর ক্লান্ত পদক্ষেপে হেঁটে চলি বালুর ওপর। আমাদের পায়ের নিচে ধুলোবালি উড়ে চলে। সামান্য কিছু আশার পেছনে ছুটোছুটি করে নেতিয়ে পড়ে আমাদের পা।

বিপদাপদে পড়ে আমরা কখনো জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তখন আমাদের চিন্তাগুলোতে ধস নামে। দুশ্চিন্তা জাল বোনে। স্মৃতিরা ঘোলাটে হয়ে আসে। মনছবি হয়ে যায় বিকৃত। কখনো অশ্রু, আবার কখনো রক্তে সিক্ত হই আমরা।

আমি জানি না, কী করে মা সেই চোখের পানি ধরে রাখেন। তার একটা অংশ যে অনুপস্থিত, সেটা তিনি কী করে আমাদের না বলে থাকেন। এখনো কীভাবে এতটা আশা নিয়ে জীবনযাপন করেন। কীভাবে তার হৃদয়ে এত প্রশান্তি!

তার দুচোখে রুপার মতো জ্বলজ্বল করে স্নেহ। বাবার কথা বলার সময় গলায় এক আশ্চর্য নম্রতা আসে। বাবার বর্ণনা দিতে গিয়ে, তার বিদায়ের কথা বলতে গিয়ে চোখের জল নিবারণ করেন তিনি।

তারপর আমরা যখন তার থেকে দূরে থাকি তখন তিনি নিজের বেদনায় ডুবে যান। বাবার সুবাস, তার গলার আওয়াজ পাওয়ার জন্য তার মন আনচান করে ওঠে। এদিকে আমরা তাকে ভুলে যাই। কতটা নিষ্ঠুর আমরা! কী নির্মম আমাদের দিনগুলি!

সকাল আসে। সবকিছু ভুলে যাই। আবার এক টুকরো আলোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু কেবল আল্লাহর স্মরণেই তা খুঁজে পাই।

হে আমার আশা-ভরসা! হে আল্লাহ! উদাসীনতায় অলসতায় ডুবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে আপনার অনুগ্রহের অপেক্ষায় থাকি। জীবনের নতুন একটি পাতা শুরু করতে চাই, যেটা বরফের মতো সাদা, বৃষ্টির পানির মতো পবিত্র—মানুষের নিঃশ্বাস যাকে নোংরা করেনি।

আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সালাত আদায়ের জন্য আগ্রহী। আমাকে নিয়ে চলুন আপনার দিকে। আমাদের নিয়ে চলুন আপনার তরে। আমি এখনো হোঁচট খেয়ে চলেছি। আমার পা-গুলো হোঁচট খাচ্ছে। আমার ঘাটতির জানান দিচ্ছে।

আমি এখনো রবের আনুগত্যের পবিত্র গুহার অনুসন্ধানে ধৈর্যের অনতিক্রম্য পাহাড়গুলোতে উঠতে ভয় করি। এখনো আমি দূরত্ব ও পথ হারানোর বেদনায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির অমানিশায় ঘুরপাক খাচ্ছি।

জান্নাতের তীব্র কামনা আমাকে মাঝে মাঝে ঘিরে ধরে। তখন আপনার সুধারণার পোশাক পরি। আপনার কিতাবে দেওয়া সুসংবাদে নিজের হৃদয়কে প্রশান্ত করার চেষ্টা করি।

আমার মনে গভীর আকাঙ্ক্ষা জন্মে ভোরবেলার বিনয়ী আওয়াজ শোনার, ফজরের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে যে মানুষগুলো অন্ধকার রাত ভেদ করে হেঁটে চলেছে, যাদের কপালে চাঁদের আলো পড়ছে—তাদের আওয়াজ শোনার।

আমি সেই নারীদের দেখতে চাই যারা নিজেদের পবিত্রতার পোশাকে আবৃত করেছে। যারা নিজেদের মাথায় পরে নিয়েছে নিরাপত্তা ও সম্মানের পোশাক।

আমার সকল ভাবনা অস্ত গেলে সূর্যোদয় ঘটে তার সমস্ত সৌন্দর্য ও মর্যাদা নিয়ে। আমাকে মুগ্ধ করে সে। সকল কিছুকে ছাড়িয়ে ওপরে ওঠে সূর্য। কারও দিকে তাকায় না। হোঁচট খায় না। কোনো অজুহাত পেশ করে না। তার পূর্বে বিরাজমান

অন্ধকারের ওপর দোষ চাপায় না। ঘন মেঘ তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। অবিরত বর্ষণ তাকে থামাতে পারে না। সে নিজের মতো ওঠে, চলে। তার অফুরান দান অব্যাহত রাখে। কী দৃঢ়তা তার মাঝে! তার আশা কত বিশাল! সূর্য অনবরত দান করে চলেছে তার আলো, এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করে না সে।

সে সত্তা কতই না মহান যিনি সূর্যকে এত ভালোবাসা দিয়েছেন। তার অনুগ্রহ ঢেলে দিয়েছেন। আলোর পোশাক পরিয়ে আলোকিত করেছেন। তাই তো সূর্যের আলো পাওয়ার জন্য সবাই প্রতিদিন উন্মুখ থাকে। সুবহানাল্লাহ!

ঝেড়ে ফেলি দুঃখ-ব্যথা। আল্লাহর কাছে দুআ করি। আশা পেশ করি তাঁর কাছে। ফিরে চলি সালাতে। পরিশুদ্ধ করে তুলি নিজেদের অন্তর। হতাশ হব না। ভেঙে পড়ব না একদম।

অতীতের আঁধার-প্রান্তে বসে চলবে পর্যবেক্ষণ। ধীরে ধীরে তা বিলীন হয়ে আসছে। আল্লাহর অনুগ্রহে নতুন সূর্যোদয় হতে যাচ্ছে আগামীকাল, সে সূর্যোদয় নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেবে জীবনটাকে।

শেষ কথা

আল্লাহর বান্দি!

আমরা যা লিখি তা আবার পড়ে দেখি। তাতে অনেক ভুল পাই। কখনো-বা চিন্তাগুলো মনঃপূত হয় না। তখন আবার মুছে ফেলি। কিছু কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিই। আবার লিখি।

কখনো ভুলটাকে কেটে দিই। সেই কেটে ফেলা লেখাটা দেখে আমরা শিক্ষা নিই; যাতে ভবিষ্যতে আর এমন ভুল না হয়। এভাবে আমরা একটা প্যারা শেষ করে সেখানে দাঁড়ি দিই। তারপর নতুন প্যারা শুরু করি আরেক লাইন থেকে।

কিছুটা ফাঁকা রেখে নতুন লাইনে শুরু করা মানে আরেকটা ভালো সুযোগ পাওয়া। কিন্তু দাঁড়ি দেবো কোথায়? আর কোত্থেকেই-বা নতুন লাইন শুরু করব?

আমাদের জীবনটা এমনই। বেশ কিছু ঘটনা-ব্যক্তি-কথাবার্তা-অবস্থার সমষ্টি।

কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী মানুষ থাকবে। তাদের মুছে ফেলতে হবে জীবনের আঙিনা থেকে। খারাপ বন্ধুরা সবকিছু বিনষ্ট করার আগেই তাদের দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে। আমরা যে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ি তা থেকে অবশ্যই আমাদের পবিত্র হতে হবে। যাতে আমাদের প্রশান্ত আত্মা গঠনে তা বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। তারপরই একটা দাঁড়ি দেবো।

কিছু হিংসুক আছে। এদের আমরা বন্ধনীর মাঝে রেখে দেবো। এড়িয়ে চলব। এদের সাথে এমন ব্যবহার করব যেন এরা অতিরিক্ত বাক্য। এদের গুরুত্বও দেবো না। এদের

পেছনে সময় দিতে গেলে আমরা গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু হয়তো মিস করে ফেলব। কিছু চমৎকার মানুষ আছে। এরা আমাদের জীবনে সবসময় জাদুকরী স্পর্শ দিয়ে যায়। এদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করব। এদের নিচে লাল দাগ দিয়ে সযত্নে রেখে দেবো।

কিছু আল্লাহভীরু পবিত্র মনের মানুষ আছে। এরা আমাদের কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে। কোনো কল্যাণকর কাজে আমাদের দেখলে এরা উৎসাহ দেয়। ভুল করলে উপদেশ দেয়। পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে উঠিয়ে দেয়। তাদের দেখলে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি। যেন তারা তাসবিহ! এদের থেকে দূরে চলে গেলেও এরা আমাদের জন্য দুআ করে। আর সাক্ষাৎ হলে আমাদের ঈমান বেড়ে যায়, ইচ্ছে তীব্র হয়। এদের অনুপস্থিতি আমাদের প্রবাস জীবনের একাকিত্বে ভোগায়। আমরা বুকে এক গভীর ব্যথা অনুভব করি। সাথে এক ভিন্ন স্বাদ; কারণ, আল্লাহর জন্য যাদের ভালোবাসি, যারা আমাদের উত্তম সঙ্গী—তাদের সাথে সাক্ষাতের বাসনা মনে পুষে রাখার এক অনাবিল তৃপ্তি আছে।

এদের কেবল লাল দাগ দিয়ে রাখলে হবে না। এদের কথা ভাষায় প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না। এদের পৃথকভাবে লিখে রাখতে হবে। এদের জন্য বরাদ্দ থাকবে ভালোবাসার ভিন্ন পাতা। হৃদয়ের গহীনে একটা পৃথক উষ্ণ অবস্থান তাদের জন্য রাখতে হবে। মাঝে মাঝে হয়তো তাদের জন্য দুআর প্রজাপতি উড়িয়ে দেবো, সে প্রজাপতি সততার সাথে উড়ে যাবে আকাশের দিকে। বহন করে নিয়ে যাবে ভালোবাসা আর আশা। চলে যাবে রাব্বে কারীমের দরবারে। কবুল হয়ে যাবে দুআগুলি।

সে দুআ থাকবে—'তাদের সাথে আমাদের জান্নাতে একত্র করার'।

ছিঁড়ে ফেলো সকল পাতা। কেটে ফেলো যত ভুল আছে জীবনের। সকল গুনাহর সমাপ্তি টেনে দাও। আল্লাহ আমাদের নতুন করে শুরু করার সুযোগ দিয়েছেন। কারণ, আমরা তাওবা করলে তো প্রতিটা গুনাহ রূপান্তরিত হবে নেকিতে। তখন আমাদের আমলনামাগুলো সাদা পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। নব-উদ্দীপনায় শুরু করতে পারব আমরা। দাঁড়ি দিয়ে। সূচনা হবে নতুন বাক্যের।

তোমরা উত্তম সাথিদের খুঁজে বের করো। যারা তোমাদের কল্যাণ ও আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। যারা সাদা মুক্তোর মতো পবিত্র। তাদের সাথে সবসময় চলবে। যাতে সবাই মিলে হতে পারো দামি মুক্তোর মালা। যে মালা বিক্রি করা যায় না, কেনা যায় না। যে মালার বাঁধন কখনো ছিঁড়ে যায় না।

আমাদের অন্যান্য সেরা গ্রন্থসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য (টাকা)
০১	বেলা ফুরাবার আগে	আরিফ আজাদ	২৮৭
০২	হৃদয় জাগার জন্য	ইয়াসমিন মুজাহিদ	২৫০
০৩	কাজের মাঝে রবের খোঁজে	আফিফা আবেদীন সাওদা	১৩৬
০৪	সুখের নাটাই	আফরোজা হাসান	-
০৫	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২	আরিফ আজাদ	৩৩৬
০৬	পড়ো	ওমর আল জাবির	২২০
০৭	আরজ আলী সমীপে	আরিফ আজাদ	২৫০
০৮	প্রত্যাবর্তন	আরিফ আজাদ	৩০০
০৯	সবুজ রাতের কোলাজ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	১৫০
১০	খুশূ-খুযূ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	১২৫
১১	মা, মা, মা এবং বাবা	আরিফ আজাদ	২৩৫
১২	ফেরা	সিহিস্তা শরীফা, নাইলাহ আমাতুল্লাহ	১৭২
১৩	তিনিই আমার রব	শাইখ আলী বিন জাবির আল ফাইফি	২৭২
১৪	জীবন পথে সফল হতে	শাইখ আব্দুল কারিম বাক্কার	২৩২
১৫	যে জীবন মরীচিকা	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	১৭৫
১৬	নবীজি ﷺ	শাইখ আয়িয আল-কারনী	২৯০
১৭	তারাফুল	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২৭২
১৮	মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি	রৌদ্রময়ীরা	২৮৬
১৯	শিশুর মননে ঈমান	ড. আইশা হামদান	১৭৬
২০	মেঘ কেটে যায়	ড. হুসামুদ্দিন হামিদ	২৬৮
২১	গল্পগুলো অন্যরকম	সমকালীন টীম	৩১৫
২২	সন্তান : স্বপ্ন দিয়ে বোনা	আকরাম হোসাইন	১৮৫
২৩	সালাফদের জীবনকথা	শাইখ আব্দুল আযীয	৩২০
২৪	কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা	শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান	২৬০
২৫	আর্গুমেন্টস অব আরজু	আরিফুল ইসলাম	২৫০
২৬	সবর	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	২৬০